ভয়েস মার্ক

পঞ্চম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৩০ টাকা

এসপিসিও-র দ্বি-মাসিক মুখপত্র

ভয়েস মার্ক

এসপিসিও ট্রাস্টের দ্বি-মাসিক মুখপত্র

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকা (বিশেষ সংখ্যা বাদে)
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান

বহরমপুর : ৯৭৩৫৮৭৪৩৮৪ / ৯৯৩২৬০৭৭১৪
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ
ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
এসপিসিও অফিস
ডিহিপাড়া, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
E-mail: voicemark19@gmail.com
spcomsd21@gmail.com
Mob: 9735874384 / 9932607714
Web: www.voicemark.in

ভয়েস মার্ক

পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩
Vol. 5 Issue: 1 Voice Mark

সম্পাদকঃ মোঃ আযাদ হোসেন

যোগাযোগঃ
Email: spcomsd21@gmail.com
voicemark19@gmail.com
WhatsApp: 9932837185
9735874384

গ্রাহক পরিষেবাঃ রনিক পারভেজ, 9378480192

প্রচ্ছদঃ হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মুদ্রণ ও অলংকরণঃ মোঃ মিনারুল হক

ওয়েব সাইটঃ www.voicemark.in

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা

পত্রিকার প্রাপ্তি স্থানঃ অফিস ছাড়াও বহরমপুর স্টেশন বুকস্টল ও সরস্বতী বুকস্টল, বহরমপুর; পাতিরাম বুকস্টল, কলকাতা; প্রাপ্তি বুকস্টল, সিমলাপাল, বাঁকুড়া; কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগনা।

সম্পাদকীয়
অধিকার ৩
সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ
ভারতীয় ফুটবলের দুর্দশা ৫
ভারত জোড়ো যাত্রা ৮
তথাকথিত EWS শ্রেণির সংরক্ষণ ১১
সেক্সটরশন ১৪
হরিয়ানা ও দিল্লির সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড ১৭
রাষ্ট্রের ওয়েলফেয়ার কর্মীদের শোষণ— ২০
প্রবন্ধ
পার্থ ব্যানার্জির দানবের পেটে দুই দশকঃ ২৪
শ্রীচেতনিক
বাম কোনো পন্থা নয়, তাহলে? ৩১
শ্রীচেতনিক
গল্প
দেশপ্রেম ৩৩
সুদীপ সরকার
হুশ ৪০
সুবীর সেন
পুনঃপাঠ
সাহিত্যের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য ৪১
মুন্সী প্রেমচাঁদ
কবিতা
তুষার ভট্টাচার্য ৪৫
ভাস্বর রুজ ৪৫
রঞ্জন পাড়ুই ৪৬
মানিক জ্যোতি দাস এর দুটি কবিতা ৪৭
বরুণ শ্যেন ৪৮

সোসিও প্ল্যান কালচার অরগানাইজেশন (এসপিসিও) ট্রাস্টের পক্ষে মোঃ আযাদ হোসেন কর্তৃক ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

অধিকার

২০২২ সাল জুড়ে আমরা দেখছি অধিকারের ধারণার উপর ধারাবাহিক আক্রমণ। অধিকারের পরিপূরক হিসাবে পবিত্রভাবে কর্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টির সূচনা করা হয়েছিল। ক্রমশ বাপারটা্কে ‘কর্তব্য অধিকারের থেকে বড়’ এই ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। এটি করা হয়েছে ‘দেশের স্বার্থ’ এর দোহায় দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী একই বছর ২০ জানুয়ারী ব্রহ্মা কুমারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বর্ষবরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে স্বাধীনোত্তর ভারতে ৭৫ বছর ধরে "অধিকারের জন্য কথা বলা এবং লড়াইয়ের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেশকে দুর্বল করে রেখেছে"। বা তিনি কখনো বলছেন ‘আন্দোলনজীবী’ কিংবা "তাদের পোশাক দ্বারা" বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করার কথা। ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে ছিল তার এই কটাক্ষ। যদিও মাত্র কিছু দিন আগে সংসদের অধিবেশনে সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭০তম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রি স্বীকার করেছিলেন যে স্বাধীনতার পর জনগণের অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল কারণ সমাজের অনেকেই সমতা ও ন্যায় থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই তিনি দাবী করেছিলেন কর্তব্য ও দায়িত্বের বিষয়টি! মানবাধিকার দিবসে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অরুণ মিশ্রের কথাতেও সেই সুর যেন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নটিকে যেন কর্তব্যের শর্তের নিরিখ থেকে দেখতে চান এমনটিই তাঁর বক্তব্য থেকে উঠে আসে। এই সময়ের মধ্যে অধিকার হ্রাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শিতল বাদের গ্রেফতার ও তাঁকে আইনি জটে আটকে দেওয়া। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ, যারা জনগণের অর্থ থেকে সহায়তা পান তাদের লাভার্থি বা প্রধানমন্ত্রীর দয়ার সুবিধাভোগী হিসাবে দেখা অধিকারের ধারণার উপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ। এই কাঠামোতে দরিদ্ররা আর সাহায্যের ন্যায্য প্রাপক নয় বরং তারা শাসকের দানশীলতার দ্বারা যেন অনুকম্পাপ্রসূত উপকৃত হচ্ছে! এবং সেই ধারাবাহিকতায় ‘বেনিফিসিয়ারি’ ধারণা দিয়ে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নটিকে গত বেশ কয়েকটি দশক ধরে কোণঠাসা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিও একই ধারায় রাজ্যে রাজ্যে এই কাজটি করেছে। এক্ষেত্রে তথাকথিত বাম-ডান কেউ-ই ব্যতিক্রম নয়।

অধিকারের সুস্পষ্ট দাবি ছাড়া সমাজ গতিশীল হতে পারেনা। উনবিংশ ও বিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির অধিকাংশ সেই অধিকার হীনতা থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শগত ভিত্তি থেকেই গড়ে উঠেছিল। তা বিধবা বিবাহ , বা সতীপ্রথা বাতিল, ব্রাহ্ম সমাজ কিংবা দক্ষিণ ভারতে দলিত আন্দোলন সবেতেই সমাজ-রাষ্ট্রের দ্বারা অধিকারের হননের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল। এবং এভাবেই অস্পৃশ্যতার মত জঘন্য ঘটনা আমাদের সমাজ তথা রাষ্টীয় জীবন থেকে দূরীভূত করা গেছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টিও অধিকার আন্দোলন এর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ শ্রম দিবস (১৮ ঘন্টার) বন্ধ করার জন্য অধিকার আন্দোলন ছাড়া কোনো গতি ছিল কি? তেভাগা আন্দোলন ছাড়া কি কৃষক সামান্য শ্রমমূল্য পেত? মেয়েদের ভোটাধিকার সম্পর্কেও একই কথা। ন্যূনতম মজুরি কতই না আন্দোলনের দ্বারা অর্জিত একটি অধিকার।

ভারতের মতো প্লুরালিস্টিক ও বৈচিত্র্যময় একটি সমাজে ব্যক্তির অধিকারের একটি অতিরিক্ত মাত্রা রয়েছে। তা নাগরিক মনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ব্যক্তি তার নিজ গ্রুপ / গোষ্ঠী / সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র ভাবেও নিজের বিকাশ ঘটাতে পারে। এটি আখেরে আমরা-ওরা বিভাজন বিলুপ্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই ব্যক্তির এই অধিকারের উদযাপন রাষ্ট্র হরণ করতে পারেনা শুধু নয়, রাষ্ট্রের তা নিশ্চিত করা দরকার।

ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তি হিসাবে অধিকার প্রদান করে, সেই সাথে প্রান্তিক বা নিপীড়িত গোষ্ঠী হিসেবেও অধিকার দেয়। কিন্তু বর্তমানে সেগুলি কেড়ে নেবার ব্যবস্থাপত্র পাকা করা হচ্ছে। তা হচ্ছে পরিচয় পত্রের নামে বা আন্তঃসম্প্রদায়ে বিবাহ বন্ধের নামে। আরো কত নামে। পরিণামে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ নিশ্চিতভাবেই বাধা প্রাপ্ত হবে। তাদের এক বগগা বা উগ্র জাত্যাভিমানী হিসেবে হয়তো মগজ ধোলাই করা যাবে? শাসক সেটাই চাইছে।

অধিকারের পরিবর্তে কর্তব্যের আহ্বান চন্ড জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কাছ থেকে, যারা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আঘাত করেন কিন্তু জাতপাতের বিলুপ্তির আহ্বান জানান না। সামাজিক ন্যায়বিচার বা জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের বিলুপ্তি দাবী তারা করেনা। পরিবর্তে নির্যাতিতরা যাতে প্রশ্ন উত্থাপন না করে বা সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট না করে তা নিশ্চিত করতে এটিকে স্থায়ী করার চেষ্টা করা হয়।

নেতার সুপার পাওয়ার ইমেজগঠন করা, ব্যক্তিকে পরিচয় পত্রের বাঁধনে বাঁধা , মানবাধিকার কর্মিদের কারারুদ্ধ করা এবং নাগরিকদের লাভার্থী বা বেনিফিসিয়ারিতে পরিণত করা একটি জাতির আত্মাকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। "অধিকার নেই, শুধু কর্তব্য", এ এক ভয়ানক প্রজেক্টের অংশ। যে প্রজেক্ট বাস্তবায়ন বিশ্ব দেখেছিল ইউরোপে গত শতকে। ভারত কি সেটিই দেখতে চাইছে?

Maa Tara Enterprise

Prop- Mangal Das

Mob: 9382128352

Contractor & Order Suppliers.

3rd Gari North,

P.O + PS: Kakdiwp

Dist: South 24 Pargana, WB

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

ভারতীয় ফুটবলের দুর্দশা

নিশিত শ্যেন

১৬ আগস্ট, ২০২২ বিশ্ব ফুটবল সংস্থা ফিফা (FIFA- Fédération International de Football Association) ভারতীয় ফুটবল সংস্থা এআইএফএফ (AIFF- All India Football Federation)-কে নির্বাসিত ঘোষণা করে। ফিফা ভারতীয় ফুটবল সংস্থায় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ও প্রভাবের কারণে (যা ফিফার আইনকে লঙ্ঘন করে) এআইএফএফ-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফিফা লক্ষ্য করে কোর্ট নিযুক্ত একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি ভারতীয় ফুটবলকে পরিচালনা করছে, যাকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করে ফিফা।

কেন এই তৃতীয় পক্ষ? পূর্বের এআইএফএফ সভাপতি প্রফুল প্যাটেল, যিনি ফিফা কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তিনি এর কারণ হিসেবে টানা দীর্ঘকালীন মহামারির অজুহাত দেখাচ্ছিলেন।

কিন্তু ১৮ মে সুপ্রিমকোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং প্যাটেলকে পদ থেকে অপসারণ করে। এআইএফএফ পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি গঠন করে। এতেই ফিফার নিয়মের বিঘ্ন ঘটে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি দ্বারা সুপ্রিমকোর্টে জমাকৃত খসড়া সংবিধানে বলা হয়েছে নির্বাচনী কলেজে ৩৬টি রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সঙ্গে সারা ভারত থেকে ৩৬ জন বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড় থাকবে। কিন্তু ফিফার নিয়ম অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটির ২৫ শতাংশ প্রাক্তন খেলোয়াড় গ্রহণযোগ্য। ফিফা বলেছে রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সঙ্গে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকা বিচক্ষণতা নয়।

শুধু কার্যনির্বাহী কমিটিই নয়, রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিসহ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের পদ্ধতি, এমনকি এই কমিটি গঠনে কারা ভোট দিতে পারবে তারও পরিবর্তন ঘটায় এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি। অন্যদিকে কোন লিগ ভারতীয় শীর্ষ লিগ হবে এবং তাদের নির্বাচন ও পদোন্নতি কীভাবে হবে তারও পরিবর্তন ঘটায়। যার ফলে আই লিগ ও সুপার লিগ এর মধ্যে কে শীর্ষ লিগে থাকবে তা নিয়ে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি গঠিত হওয়ার সময় নির্বাসনের কথা বললেও প্রাথমিকভাবে ফিফা নিষেধাজ্ঞা স্থগিত রাখে। কিন্তু কোনো নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়াই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির এই পরিবর্তনগুলিকে ফুটবলের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখে। ফলস্বরূপ নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে ফিফা এআইএফএফ এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

নিষেধাজ্ঞার ফলে কী ক্ষতি হলো? নিষেধাজ্ঞার অর্থ ভারত কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে পারবে না। অর্থাৎ সমস্ত বয়সের ভারতীয় জাতীয় দল তা পুরুষ বা মহিলা যাই হোক না কেন, কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞা ভারতের ক্লাব দলগুলির ওপরও প্রযোজ্য।

এমনকি এআইএফএফ কর্তারা কোনো কোর্স বা উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামেও অংশ নিতে পারবে না। সামগ্রিক অর্থে ভারতের বাইরে ফুটবল সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা।

এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে ভারতীয় ফুটবলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়—

(ক) ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ ফুটবল দল এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৩ এর যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হয় তবে ভারত এশিয়া কাপে অংশ নিতে পারবে না।

(খ) ভারত অনূর্ধ্ব-১৭ ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু এই আয়োজন তখনই সম্ভব কেবলমাত্র যদি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়।

(গ) মে মাসে আয়োজিত ভারতীয় মহিলা লীগ জেতার পর গোকুলাম কেরালা দ্বিতীয়বারের জন্য এএফসি মহিলা ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ এর যোগ্যতা অর্জন করেছিল। নিষেধাজ্ঞার কারণে এই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় দলটি উজবেকিস্তান থেকে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়।

(ঘ) অধিনায়ক আশালতা দেবীর নেতৃত্বাধীন ২৩ সদস্যের ভারতীয় দল নিষেধাজ্ঞা আরোপের দিন থেকে ছয় দিন যাবৎ উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে আটকা পড়েছিল নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে।

(ঙ) এটিকে মোহনবাগান এএফসি কাপের সেমিফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করেছে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার জন্য এতে অংশগ্রহণ করতে পারা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

(চ) ২০২৩ অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের অক্টোবরে নির্ধারিত ম্যাচগুলোতে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের দলের অংশগ্রহণ ঝুঁকির মধ্যে আছে।

নিষেধাজ্ঞার পরে কী ঘটলো? এই নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় ফুটবলসহ ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সকলের উপর একটি দুশ্চিন্তার রেখা টেনে দেয়। প্রাক্তন ও বর্তমান বিশিষ্ট খেলোয়াড়সহ ফুটবলপ্রেমী ও প্রায় ৩০ কোটি ভারতীয় ফুটবল দর্শক নিন্দায় মুখরিত হলো। ১৬ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টকে তড়িঘড়ি শুনানির আর্জি জানায়। ২১ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টে কেন্দ্র সরকার ফিফার দাবি অনুসারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি প্রত্যাহারের একটি আবেদন করে। পরের দিন ২২ আগস্ট সুপ্রিমকোর্ট সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার অনুরোধে বিষয়টি স্থগিত করে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি বাতিল করে। এবং এআইএফএফ-এর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্র সরকারকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করে।

নিষেধাজ্ঞা কি এখনো আছে? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হওয়ায় এআইএফএফ প্রশাসন এআইএফএফ-এর সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফিফা ও এএফসি-র নিয়ম অনুসারে এআইএফএফ-এর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হবে এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এআইএফএফ-এর পরিষদ গঠন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এই বিষয়ে নিশ্চিত করায় ফিফা ২৬ আগস্ট নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

প্রসঙ্গত, ২ সেপ্টেম্বর এআইএফএফ এর সভাপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারিত করা হয়। কিংবদন্তি খেলোয়াড় ও প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া এবং প্রাক্তন গোলকিপার কল্যাণ চৌবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবং কল্যাণ চৌবে একরকম একচেটিয়াভাবেই (৩৪ এর মধ্যে ৩৩ ভোট পেয়ে) এআইএফএফ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

পরিশেষে, এটা স্পষ্টই যে ফিফার এই নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় ফুটবল সহ সমগ্র ভারতবাসীকে বিশ্বের দরবারে লজ্জার সম্মুখীন করে। ক্ষমতালোভী

প্রশাসকের অকর্মণ্যতার কারণে ৮৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এআইএফএফ-কে এমন বিপদে পড়তে হলো। বাইচুং ভুটিয়া, শাব্বির আলি, জেজে লালপেখলুয়া, রবিন সিং, সুনীল ছেত্রীর মত খেলোয়াড়রা ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্বের দরবারে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তা এক লহমাতেই শেষ হতে যাচ্ছিল। বর্তমানে ফিফা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং এ ভারতের অবস্থান ১০৪ (২১১ টি দেশের মধ্যে)। ফিফা কিছুদিন আগেই দেশের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে সুনীল ছেত্রীকে স্বীকৃত দেয়।

প্রসঙ্গত, একটি ক্রীড়ার উন্নতির ক্ষেত্রে খেলোয়াড়, প্রশাসকের অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সেই খেলায় অর্থ বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যদিও ক্রীড়া বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৬২.৬০ কোটি হয়েছে (পূর্বে ২৭৫৭.০২ কোটি), কিন্তু তার সামান্য অংশই ভারতীয় ফুটবলে ব্যয় হয়। ভারতীয় ফুটবল দলের 'খারাপ পারফরম্যান্স' এর অজুহাত দেখিয়ে সরকার গত চার বছরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) এর তহবিল প্রায় ৮৫ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। বার্ষিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩০ কোটি থেকে কমে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১০ কোটি ও ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৫ কোটিতে নেমে এসেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ফুটবলের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল অ্যাথলেটিক্স (৩০ কোটি), ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, হকি, শ্যুটিং (প্রতিটি ২৪ কোটি), তীরন্দাজ (১৫.৮৫ কোটি) এবং ভারোত্তোলন (১১ কোটি) সহ অন্যান্য প্রধান খেলাগুলির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে অনেক কম। এমনকি টেনিস (৫.৫ কোটি), অশ্বারোহী (৬ কোটি) এবং ইয়টিং (বাইচ খেলা) (৫.২ কোটি)ও চলতি আর্থিক বছরের জন্য ফুটবলের চেয়ে বড় বাজেট পেয়েছে।

যখন নীরাজ চোপড়া গত অলিম্পিকে জ্যাভেলিন ছোঁড়ায় সোনা জিতলেন তখন সকলে এই খেলার প্রতি আগ্রহ দেখালো এবং বাজেট বৃদ্ধির কথা বললো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো খেলার সাফল্য দেখে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে নাকি ব্যয় বৃদ্ধি করে সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে হবে? সুতরাং প্রতিটি খেলার প্রতিই কেন্দ্র ও রাজ্যের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

ভারত জোড়ো যাত্রা

দীর্ঘ শীতঘুম কাটিয়ে এবং প্রায় আট বছর ভারতীয় জনতা পার্টিকে একপ্রকার ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে রেখে অবশেষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। রাহুল গান্ধি 'ভারত জোড়ো যাত্রা' মুভমেন্টের ডাক দিয়েছেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের দক্ষিণতম কন্যাকুমারিকা থেকে এই যাত্রার সূচনা করা হয়েছে। প্রায় ১৫০ দিনের এই যাত্রায় ৩৫৭০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করা হবে। ইতিমধ্যেই ৫০ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। শাসক বিজেপি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় এই যাত্রা কর্মসূচিকে ব্যঙ্গ করেছে। বলেছে এটা আসলে ভারত জোড়ো যাত্রা না, এটা আসলে পরিবার বাঁচাও যাত্রা! কংগ্রেসের মধ্যে এবং কংগ্রেসের বাইরে অনেক দল, গোষ্ঠী এই কর্মসূচির প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছেন। কর্পোরেট মিডিয়া শাসকের পক্ষে যাত্রা কর্মসূচিকে ব্যঙ্গ করেছে, কভারেজ দেয়নি। রাহুল গান্ধীর পাপ্পু ইমেজ এর সাথে এই কর্মসূচিকে হালকা করবার প্রয়াস করেছে প্রথম দিন থেকে।

কিন্তু যতই দিন গড়িয়েছে এ যাত্রায় ব্যাপক মানুষ সংযুক্ত হতে থেকেছে এবং বলা বাহুল্য সংবাদ মাধ্যম না চাইলেও ক্রমশ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে। এবং এখন যখন এই কর্মসূচির প্রভাব আরো বাড়তে শুরু করেছে শাসক শিবিরে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। এই যাত্রা কর্মসূচিতে জনসংযোগ করতে গিয়ে কংগ্রেস কী কথা বলছে? বলছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বেকারত্বের কথা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা, সংবিধান বাঁচানোর কথা, সংবিধানের স্পিরিট প্রটেক্ট করবার কথা। এইগুলিই।

যাত্রা কর্মসূচির পরিকল্পনায় ভারতের দক্ষিণতম রাজ্য থেকে উত্তরতম রাজ্যের দিকে পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। বিভাজনের রাজনীতির হাত থেকে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা এ যাত্রা কর্মসূচির অন্যতম ঘোষিত উদ্দেশ্য। কংগ্রেস সূত্র জানাচ্ছে, It's main objective is to fight against the politics of fear, bigotry and prejudice and the economics of livelihood destruction increasing unemployment and growing in equalities.

এই কর্মসূচির স্লোগানগুলি লক্ষণীয়, যেমন— 'মিলে কদম জুড়ে বতন', 'মেহেঙ্গাইসে নাতা তোড়ো, মিলকার ভারত জোড়ো', 'বেরোজগারিকা জাল তোড়ো অর ভারত জোড়ো', 'সংবিধান বাঁচাও' ইত্যাদি।

এখন পর্যন্ত ডিএমকে এই কর্মসূচি সমর্থন করেছে। ডিএমকে প্রধান স্ট্যালিন রাহুল গান্ধির সঙ্গে একসঙ্গে কন্যাকুমারীতে এ যাত্রা সূচনা করেছেন। এনসিপি এই কর্মসূচির প্রশংসা করেছে। শিবসেনা সমর্থন করেছে। স্বরাজ ইন্ডিয়া এই কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে। আম আদমি পার্টি এ কর্মসূচিকে ব্যঙ্গ করেছে এবং বলেছে জনমনে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। সিপিএম প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচি সমালোচনা করেছিল পরবর্তীতে নিমরাজি অবস্থায় ভালো বলেছে।

শাসক দল বিজেপি এ কর্মসূচিকে কেবল ব্যঙ্গ করেনি, কেবল পরিবার বাঁচাও র‍্যালি বলেনি। সাথে সাথে তার তাঁবেদার কর্পোরেট মিডিয়া গোষ্ঠীকে লেলিয়ে নানান ফেক নিউজ স্প্রেড করে কলঙ্কিত করবার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রেক্ষাপট

ইউপিএ-২ সরকারের পতনের পর ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতা ও তার ব্যবহারের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। জনগণের জীবনমানের সিচুয়েশন এর ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনে কোন একটি সরকারের ম্যাণ্ডেট পাওয়া না পাওয়া আর নির্ভর করছে না। মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিদ

নোয়াম চমস্কি যেমন বলেন ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট বা মগজ ধোলাই এর মাধ্যমে সহমত আদায় করে নেওয়ার এই কাণ্ডটি এখন সারা পৃথিবীর মতো ভারতবর্ষের ক্ষমতার ম্যাণ্ডেট নির্ধারণ করছে। ছোট্ট একটি প্রতি তুলনা দেওয়া যেতে পারে। ৫ বছরের শাসন ক্ষমতায় অটল বিহারী বাজপেয়ি নানান ধরনের ঝা চকচকে প্রচার ও মিডিয়া হাইপ তুলেছিলেন। কিন্তু জনগণের যাপিত জীবনের যন্ত্রণার অবসান ঘটেনি। পরিণতিতে পরবর্তী নির্বাচনে ব্যাপকভাবে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। ২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতায় আসার পর প্রথম পাঁচ বছরে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে যা পরবর্তী নির্বাচনে তার পুনঃনির্বাচিত হয়ে আসাটা কোনভাবেই সম্ভব হবার কথা নয়। কারণ নোট বাতিলে জনগণ ভুগলো। ১৫০ জন মারা পড়ল। ছোট ব্যবসায়ীরা ধ্বংস হয়ে গেল। অপরিণাম দর্শী গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স (GST) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আরও শেষ করে দিল। নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতা কেন্দ্র গুজরাটে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিলেও নির্বাচনে তেমন কিছু প্রভাব পড়ল না। তার দল পুনরায় নির্বাচিত হল। এজেণ্ডা কে সেট করছে? জনগণ, তাদের যাপিত জীবনের যন্ত্রণা, নাকি অন্য কেউ, অন্য কিছু? নিশ্চিতভাবেই এমনকি জনগণের যাপিত জীবনের যন্ত্রণাও তাকে রুলিং এস্টাবলিশমেন্ট এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে সাহস দিচ্ছে না। তার মানসিকতাকে দুমড়ে মুচড়ে ননসেন্সিক্যাল সেন্টিমেন্টাল অ-বিষয়ে স্থাপন করে দিচ্ছে। আর এই কাণ্ডটি ঘটাচ্ছে এ যুগের কর্পোরেট মিডিয়া হাউস। এখন আর শাসকের পক্ষে কথা বলবার জন্য তার মিডিয়া প্রতিনিধির খুব একটা দরকার পড়ে না, কোনো একটি মিডিয়া হাউসের সঞ্চালকই যথেষ্ট। দেশের সান্ধ্যকালীন টকশো গুলোর দিকে তাকালেই খুব সহজে এটি বোঝা যায়।

শাসক ও মিডিয়া হাউস কোন কোন এজেন্ডার মধ্যে দিয়ে জনগণের যাপিত জীবনের যন্ত্রণাকে গৌণ করে দিতে পেরেছে, পারছে?

১। প্রধানত তথাকথিত ধর্ম সম্প্রদায়গত সেন্টিমেন্টাল ইশ্যু। মন্দির মসজিদ।

২। সীমান্ত যুদ্ধ। প্রতিবেশি শত্রু রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।

৩। পোস্ট ট্রুথ অর্থাৎ সত্য বলে আর কিছু নেই, তুমি কোনো ব্যাপার কে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করছো, প্রচার করছো, ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছ এটাই সবকিছু। গোটা ব্যাপারগুলি কর্পোরেট মিডিয়া হাউস এর মাধ্যমে নিত্যদিন মানুষের মস্তিষ্কে এমনভাবে সংক্রামিত করা হচ্ছে যাতে মনে হয় যা দাসত্ব তাই নরমাল! স্বাধীনতা আর দাসত্ব আলাদা করে বুঝবার কোন উপায় নেই!

এরকম সিচুয়েশনে দেশের বিরোধী রাজনীতি কোনো বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর রাখতে পারছে না। শাসকের পক্ষ থেকে পার্টি ফাণ্ডিং ও বিরোধী রাজনীতির পরিচালকদের স্টেট মেশিনারি দিয়ে নানান হয়রানি করে ব্যস্ত রাখছে! ফলে চলতি জনজীবনের ইশ্যুগুলি নিয়ে তারা সুচিন্তিত কর্মসূচি নিতে পারছে না।

কর্পোরেট মিডিয়া সহযোগ অথরিটারিয়ান শাসনের যে দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে রচিত হচ্ছে তার বহুমুখী আক্রমণে বিরোধীরা কার্যত দিশেহারা।

শুধু শাসক শিবিরের আক্রমণ নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বলুন আর তথাকথিত বাম মার্গী বিভিন্ন পার্টির কথাই বলুন এরা সমকালীন আর্থসমাজের স্বরূপ ও সেই স্বরূপ কেন্দ্রিক **সমকাল রাজনীতির ভাষা** নির্মাণ করতে পারছে না। জেনারেশন পাল্টে গেছে অথচ রাজনীতির ভাষা পরিবর্তিত হচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সেই ভাষাটি কেমন ছিল? কয়েকটি দৃষ্টান্ত— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভাইচারা, দারিদ্র দূরীকরণ, বিবিধের মাঝে ঐক্য ইত্যাদি!

সেগুলি নিয়ে ৭০ বছর অতিক্রান্ত! সমস্যাগুলো অপরিবর্তিত! শাসন ক্ষমতায় ওই স্লোগানের প্রতিনিধিই দিল্লির রাজসভা অলংকৃত করেছে। বর্তমান ক্ষমতা বিরোধী ভূমিকায় ছিল! সে আজ জোর গলায় বলছে, ওইসব স্লোগানগুলো মিথ্যে! লোক ভোলানো, ক্ষমতা ভোগ করার মন্ত্র! অতএব আমি দিচ্ছি তোমাকে নতুন ভাষা, নতুন কণ্ঠস্বর, নতুন গৌরব!

সেগুলি কী? এক দেশ এক ভাষা, এক দেশ এক নির্বাচন। এক দেশ এক ধর্ম! গর্বসে বল হাম হিন্দু হে! দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়মে নেতির না-বাচক নেতিকরণে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে! অর্থাৎ কংগ্রেস পরিচালিত ক্ষমতার স্বরূপ ছিল না বাচক! তার প্রমাণ শ্রেণি সমাজ! বৈষম্য! দারিদ্র ইত্যাদি! কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বিবিধের মাঝে ঐক্য, দারিদ্র দূরীকরণ, জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি এই ব্যাপারগুলো তাদের রাজনৈতিক স্লোগান থেকে বাদ দিয়েছিল? না, কোনো দিনই দেয়নি! একদিকে তাদের নেতৃত্বে ধন কুবেরদের পক্ষে আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন ও অন্যদিকে 'বিবিধের মাঝে ঐক্য' এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তার চরিত্রের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে তুলেছিল! সেই অন্তঃসারশূন্যতার ফাঁক গলে ক্ষমতার সন্ধানে আরেক না বাচক শক্তি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ঘাপটি মেরে থেকে তার মাথা মুখ বের করে নিয়ে এসেছে! ২০১৩ সালে সে কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে!

দ্বিতীয় টার্মের তাদের শাসনের বর্তমান স্বরূপ হল ব্যাপক বেকারত্ব, ভয়ানক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষাক্ত পরিবেশ!

কিন্তু বিরোধী ভূমিকায় এই কংগ্রেস এবং দেশব্যাপী তার সমধর্মী যে শক্তিগুলি রয়েছে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক ভাষা চয়নে আপেক্ষিক সমাজস্বরূপ সাড়া দিতে পারছে না কারণ তাদের চয়নকৃত ভাষা ও কর্মসূচি ব্যাকডেটেড! এরকম আবহে দু দুটি নির্বাচনে চরমভাবে পরাজিত হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেসের তরফে রাহুল গান্ধী এই ভারত জোড়ো কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন!

স্লোগান ও বিষয়বস্তু

সংবিধান বাঁচাও, বিবিধের মাঝে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ সমস্ত স্লোগানগুলি কতটা জনমনে প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ও সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করো, বেকারত্ব হটাও, বৈষম্য হটাও, এই সমস্ত স্লোগানগুলি নিঃসন্দেহে জনমনে প্রভাব ফেলছে কারণ আজ সারা দেশ এইগুলি থেকেই ভুগছে। ভোগান্তির কারণ প্রো-কর্পোরেট চরম নীতি প্রণয়ন। লকডাউন পূর্ব ও লকডাউন পরবর্তী সময়ে ভারতীয় কর্পোরেট হাউসগুলির সম্পদ বৃদ্ধির তুলনা করলেই প্রমাণ মিলে কীভাবে দেশের সম্পদ কয়েকটি মাত্র কর্পোরেট হাউসে গিয়ে জমা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই দেশের ব্যাপক মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গুজরাট সহ কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনের প্রেক্ষায় সিএসডিএস লোকনীতি একটি সমীক্ষা করেছে। সেই সমীক্ষায় গুজরাটের নাগরিকদের প্রশ্ন করা হয়েছে নির্বাচনের সময় তাদের মন ও মস্তিষ্কে কোন এজেন্ডা প্রাধান্য করছে। সমীক্ষা স্যাম্পলের একান্ন শতাংশ মানুষ জানিয়েছে বেকারত্বের কথা! অর্থাৎ বর্তমান শাসক দলের শাসন আমল জুড়ে যেভাবে আর্থসামাজিক সম্পদ কেন্দ্রীকৃত হয়েছে। ব্যাপক জনতা তার দ্বারা ভুগছে। এই ভোগান্তিকে ভাষা দেবার ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনীতির ভূমিকাটাই আমরা খুঁজে দেখছি, ঘুরে দেখছি! কংগ্রেস তার ভারত জোড়ো যাত্রায় এই ইশ্যুটি সামনে আনছে!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা। প্রযোজ্য ইশ্যুটি সামনে

পরবর্তী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

EWS ক্যাটেগরি অর্থাৎ উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ

১০৩ তম সংবিধান সংশোধন বিষয়টি কী? সংবিধানের ১২৪ তম সংশোধনী বিল পেশ ও পাস হয় আট ও নয় জনুয়ারি ২০১৯ সালে। এটি প্রেসিডেন্টের সম্মতি লাভ করে ১০৩ তম আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৯ রূপে। সংবিধানের ১৫/৬ ও ১৬/৬ ধারায় সংশোধনী সংশ্লিষ্ট করা হয়। এ সংশোধনী সংবিধানের মৌল ভিত্তি লংঘন করে এই মর্মে মামলা হয়। সেই মামলার রায় হয়েছে গত ৭ নভেম্বর ২০২২।

১০৩ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য সরকারি চাকরি ও সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষায় ১০% সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ ৩-২ বিভাজিত রায়ে সরকারের আইন পরিবর্তনের বিষয়টিতে সিলমোহর দিয়েছে।

বিচারপতি জেবি পরিওয়ালা, বেলা ত্রিবেদী ও দীনেশ মাহেশ্বরীর মতে এই রায় এসেছে। অন্যদিকে বিচারপতি ইউ ইউ ললিত এবং রবীন্দ্র ভাট এই জাজমেন্টের বিরুদ্ধে মতামত দেন।

বিষয়টিতে সার্বিকভাবে ঢুকবার আগে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এক, অর্থনৈতিক স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতে পারে কি?

বিচারপতি মাহেশ্বরী বলেন, হ্যাঁ পারে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পূর্বেকার অবস্থান ছিল অর্থনৈতিক ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে কেবলমাত্র পশ্চাদপদতা নির্ধারণ করা যায় না।

সংবিধান ব্যক্তি কেন্দ্রিক সংরক্ষণের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয়নি, দিয়েছে কমিউনিটিকেন্দ্রিক বিষয়টিকে। তাই ট্যাক্স ছাড় বা অনুরূপ সাবসিডির সুযোগ ব্যক্তি নিতে পারলেও সরকারি চাকুরী বা শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এর ভিত্তিতে হতে পারে না। এটি এই কেসে সংখ্যালঘু বিচারপতিদের মতামত।

দুই, ঐতিহাসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া বর্গের অর্থাৎ সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব বা ওবিসিদের এই সংরক্ষণের সুযোগ না পাওয়াটা কি বৈষম্য নয়?

এ প্রসঙ্গে মেজরিটি মতামত হলো, না। কারণ এদের মতে— There cannot be competition of claims for affirmative action based on disadvantage. Reservation cannot be denied to one section that is EWS because that section is otherwise not suffering from other disadvantages.

আদালতের সংখ্যালঘু মতে বিচারপতি ভাট একে বৈষম্য বলে অভিহিত করে তিনটি কারণ দেখিয়েছেন-

ক) সামাজিকভাবে প্রশ্ন বাচক ও বেআইনি রীতির দ্বারা চাপা পড়া মানুষদের এই সংরক্ষণের সুবিধা 'অপর' করে দেয়। অথচ এরাই সমাজের সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ। বিষয়টি সংবিধানের ভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ Fraternity বিরোধী।

খ) এই সংরক্ষণ সিডিউল কাস্ট পনেরো শতাংশ সিডিউল ট্রাইব সাড়ে সাত শতাংশ এবং ওবিসি ২৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক এই বিষয়টিকে লঙ্ঘন করে।

গ) তৃতীয়ত, এই সংরক্ষণের সুবিধা এসসি, এসটি ওবিসিদের সংরক্ষণের ভিত্তি (Basis) পরিবর্তনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করে। অর্থাৎ পশ্চাদপদতার নিরিখ তারা পাল্টাতে পারবে না। অর্থাৎ Mobility from reserve quota based on past discrimination to reservation benefit based on economic deprivation এ তারা আসতে পারবেনা।

তৃতীয় প্রশ্ন, ১০% EWS সংরক্ষণ কি সংরক্ষণের ৫০ শতাংশ সিলিং অতিক্রম করে যাচ্ছে না?

১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট ইন্দিরা সাহানি ভার্সেস ভারত সরকার মামলায় যে রায় দিয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে কী বলেছিল? সেটি ছিল ৯ জন বিচারকের বেঞ্চ। তাতে ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু দশ শতাংশ অর্থনৈতিক ক্রাইটেরিয়া ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রস্তাব নাকচ হয়েছিল। বিচারকরা সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন শুধু আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া ব্যাপারটি নির্ণিত হতে পারে না। আরো বলেছিলেন সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ সীমা অতিক্রম করতে পারেনা কারণ তাতে ইকুয়ালিটি-নীতি লঙ্ঘিত হয়। বর্তমান মামলায় ক্ষুদ্রতর বেঞ্চ বৃহত্তর বেঞ্চের রায় ওভার রুল করতে না পারলেও EWS কোটার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে।

চার, ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কি ১০% ই ডব্লু এস সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হবে?

সংবিধানের ১৫/৫ ধারায় রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ লাগু করতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সংরক্ষণের আওতায় এসে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত সংবিধানের ১৫ (৪) এবং অথবা ১৫(৫) এবং অথবা ১৬ (৪) ধারা যেগুলিতে সংরক্ষণের ট্র্যাডিশনাল বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিকভাবে শূদ্র ও দরিদ্রদের প্রতি অন্যায় থেকে অ্যান্টি কাস্ট মুভমেন্টের ভাবনা আসে। এবং ভাবনা থেকেই তাদের (কথিত শুদ্র ও দরিদ্র) মেইনস্ট্রিমিং করবার লক্ষ্যে—

এক, আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

দুই, 'শাস্ত্রগত' নিজ অবস্থানের ভিত্তিতে অমানবিকভাবে তাদের 'অপর' করে রাখার ক্ষতিপূরণ করা।

তিন, রাজনীতিক ক্ষমতা, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা। যাতে এরাও জাতি গঠনে অংশ নিতে পারে।

বি আর আম্বেদকর সংরক্ষণকে এই হিসেবে দেখেছেন। দারিদ্র দূরীকরণী কর্মসূচি হিসেবে নয়। রামস্বামী পেরিয়ারও তাই।

শতাব্দী ভর চলমান এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে নেগেট করে সুপ্রিম কোর্ট ১০৩ তম সংবিধান সংশোধনকে অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটেগরির মধ্যে থেকে EWS-এর ১০% রিজার্ভেশন অনুমোদন করেছে।

অতীতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বক্তব্য ছিল মেরিট! ঐতিহাসিকভাবে উৎসর্গ, উপহার নেওয়া, পূজা আচ্চা করা, তথাকথিত আধ্যাত্মিক মেন্টরসিপ এবং শিক্ষণ এই বিষয়গুলিতে ব্রাহ্মণদের মনোপলি ছিল। সম্পদ সৃষ্টির ক্রমগত প্রফেসনগুলিতে মনোপলি ছিল বৈশ্যদের।

এই মনোপলিগুলিকে বৈধ করা হয়েছিল শাস্ত্রীয় সমর্থনের মাধ্যমে (মনুস্মৃতি বা অর্থশাস্ত্র) যাতে উচ্চ তিন বর্ণ শিক্ষণ শিখনের সুবিধা পেয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতে এই ব্যবস্থায় ভাটা পড়ল। আধুনিককরণ, শিল্প আইন, প্রফেসরশিপ এবং জ্যোতিরাও ফুলে, পেরিয়ার, আম্বেদকর প্রমুখ নেতাদের চাপ পূর্বেকার অলিখিত সংরক্ষণ অর্থাৎ জাত ব্যবস্থার উপর আঘাত হানলো। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগকে সংরক্ষণ মুক্ত করা (ডিরিজার্ভ)।

কিন্তু ২০১৯ সালে যখন EWS Reservation আইন হল তখন মেরিটের কথা কেউ বলল না। না বলার কারণটা অতি সহজবোধ্য। সুযোগটি উচ্চবর্ণের জন্যে বলেই তো!

ভারতীয় জনতা পার্টি এই রায় কে স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের মতে এই রায় Social Justice to the

country's poor'।

৮ লক্ষ বার্ষিক উপার্জন এবং ১০০০ বর্গফুট ছাদ বিশিষ্ট বাড়ি আছে এমন ব্যক্তিদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিকে ৩০ কোটি জনসংখ্যা বিপিএল অর্থাৎ দারিদ্র রেখার নিচে।। এরা দিনে শহরের ক্ষেত্রে ৩২ টাকা এবং গ্রামে দিনে ২৮ টাকা খরচা করতে পারে না। দেশ ও রাজ্যের তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায় এদের মধ্যে এসসি, এসটি ও ওবিসি উচ্চবর্ণের থেকে অনেক বেশি দুর্বল অর্থাৎ ৩০ কোটির মধ্যে এদের শেয়ারই বেশি।

আমরা এমন দেশে বাস করি যেখানে ৭৫ টাকা বেশি দৈনিক আই হলে তারা দারিদ্র্য রেখার উপরে অবস্থান করে । সেখানে একজন উচ্চবর্ণের থেকে দিনে ২২২ টাকা উপার্জন করলে তাকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর লোক হিসেবে ধরা হচ্ছে। একে কী বলা যায়? প্রহসন না অন্য কিছু?

রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের তথ্যে জানা যাচ্ছে বছরে ১০ লাখের বেশি উপার্জন এমন মানুষের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার এক শতাংশের কম।

৯০ এর দশকে উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীরা মণ্ডল কমিশনকে তীব্র সমালোচনা করে। তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই এই দাবি করে। কিন্তু মন্ডল কমিশন ১৮৯১ ও ১৯৩১ এর জাতীয় জনগণনা থেকে তথ্য নিয়েছিলেন। এবং মন্ডল পশ্চাৎপদতার ধারণাটি সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক মাত্রার ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করেন।

কিন্তু কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্যই EWS সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেওয়া হলনা।

মন্ডল কমিশন বলেছিল to equate the unequal is to perpetuate inequality. EWS সংরক্ষণের বিষয়টিকে Go-ahead বলে সুপ্রিম কোর্ট সেই unequal দের equate করে দেয়। affirmative action category এর যুক্তি দেয়।

মন্ডল কমিশনের বাস্তবায়নের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করে ছিল। বিজেপি রথযাত্রা করেছিল। নীচের শ্রেণির দলিতদের মধ্যে রাম মন্দির ইশ্যু ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ উচ্চবর্ণের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এটিকে সাপোর্ট করছে। ৫০% অতিক্রম না করার ব্যাপারটিকে সুপ্রিম কোর্ট সিরিয়াসলি দেখছেনা।

পরিণামটি কী? পেরিয়ার কথিত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দিকে যাত্রা করার দিন কি ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে?

---

১০ পৃষ্ঠায় পরবর্তী অংশ

নিয়ে আসছে বটে কিন্তু তার সমাধানে সে কী ভূমিকা নেবে? কী কর্মসূচি নেবে তার গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য উত্তর সে কি দিতে পারছে? অতীতের ডোল পলিসির কিছু রকম ফের ছাড়া কি আর কিছু আছে?

পাঞ্জাবের নির্বাচনে আম আদমি পার্টি এই ডোল পলিসির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হল এই কিছুদিন আগে। তাতে কিছু চমক, কিছু নতুনত্ব ছিল, বলা ভাল বিজেপির হিন্দুত্বতেও সে ভাগ বসিয়েছে প্লাস ডোল! কিন্তু কংগ্রস তথা বিরোধীরা?

এই প্রশ্নের উত্তরহীনতার মধ্যেই নিহিত বার বার চন্ড শক্তির কাছে পরাজিত হবার বাস্তবতা!

ওয়েট এন্ড ওয়াচ!

সেক্সটরশন

দিন পনেরো আগে ব্যস্ত অফিস সিডিউল। পাবলিক ডিলিং পারসোনেল বছর চল্লিশের সফিক জামান লোক সামলাতে ব্যস্ত! অফিসের প্রথমার্ধ। প্রতিদিনের তুলনায় ভিড় একটু বেশি।

তার সামনে অন্তত ১৫ জন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরই মধ্যে এক দম্পতি এসেছে। বাবা মারা গেছে। কৃষক বন্ধু ডেথ বেনিফিট ক্লেইম করতে।

জামানের কাজ হল মৃত ব্যক্তির ব্যাঙ্কের খাতায় তার মৃত্যুর পর কোনো টাকা জমা হয়েছে কিনা দেখে নেওয়া। এবং হলে ব্যাঙ্ককে নোটিস পাঠিয়ে তা সরকারি তহবিলে প্রত্যার্পণ করানো। সেই দম্পতি ডেথ সার্টিফিকেট এর জেরক্স আনেনি। জামান বলল, এই নিন নাম্বার। বলে নিজের ফোন নম্বর ওকে দিল। এবং বলল, এই নাম্বারে হোয়াটস অ্যাপ করে দিতে, তাহলে প্রিন্ট করে নেওয়া যাবে।

লোকটি নম্বরটি মোবাইলে লোড করছে। জামান অন্য লোক সামলাচ্ছে। হঠাৎ তার মোবাইলের হোয়াটস অ্যাপে একটি মেসেজ এল-- Hallow!

সে ভাবলো সেই লোক বোধ হয় মেসেজ করলো--- সে কাজ করতে করতে উত্তর দিল-- Yes...

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটি সেই ডেথ সার্টিফিকেট দিল। জামান লক্ষ্য করল, সেটা আলাদা নম্বর! যাহোক, অত নজর করার সময় পেল না। কিছুক্ষণ বাদে ডেস্ক ছেড়ে বাথরুমে যাচ্ছে! ঘরের দরজাটি অতিক্রম করতে যাবে সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। সে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়ছে। জামান তার কথা শুনতে একটু দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে মোবাইলে একটি হোয়াটস অ্যাপ ভিডিও কল। সে অত খেয়াল না করেই ধরে ফেলেছে, মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে। অমনি সে দেখল স্ক্রিনে অনলাইন লাইভ নেকেড ভিডিও! নিজের চেহেরা তার অত ভালো করে আসে নি! অতি দ্রুত সে রেড বাটন টিপে দেয়! এবং দ্রুত নাম্বারটি ব্লক করতে গিয়ে নাম্বারটি ডিলিট হয়ে যায়!

ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যায় যে কেন কীভাবে ভাবার ফুরসত সে পায়নি!

লোকগুলিকে বিদায় করে সে অফিসের কলিগদের গোটা ঘটনাটি জানালো! তারা সতর্ক থাকতে বলল। উপরের ঘটনাটির সাপেক্ষে পরবর্তী আলোচনাটি আশা করি প্রাঞ্জল হবে!

সেক্সটর্শন অপরাধ হল তাই যাতে কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ইন্টিমেট ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করা হয়।

১। ৩১ অক্টোবর ২০২২ কর্ণাটকের এক সিনিয়র বিজেপি এমএলএ WhatsApp-এ একটি ভিডিও কল রিসিভ করেন। অতি অল্প সময়ের সেই কলে উল্টোদিকে নারী দেহের নগ্ন ভিডিও দেখানো হয় তাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কল করে সেই চ্যাট তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তার কাছে টাকা চেয়ে হুমকি ফোন আসে।

সেই ঘটনা কর্ণাটকে খবরের শিরোনামে আসে। এক্ষেত্রে টাকা বা মূল্যবান সামগ্রী শুধু নয় অনেকেই এই ব্ল্যাকমেলের খপ্পরে পড়ে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে।

২। বেঙ্গালুরুর এক তরুণ ডাক্তার সুসাইড করেছেন। আগস্ট ২০২১ এর ঘটনা। এই ঘটনায় ডাক্তার ব্ল্যাকমেলারকে ৬৭ হাজার টাকা দিয়েছিল। ক্রমশ ডিমান্ড বাড়তে থাকে। একসময় সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

৩। পুলিশও বাদ যায়নি। গত সেপ্টেম্বরে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশকে একইভাবে

ব্ল্যাকমেইল করা হয়। তিনি সাইবার সেলে কমপ্লেন করেছেন। এখনো পর্যন্ত অপরাধীরা ধরা পড়েনি। ৪। কয়েক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে এই ধরনের ব্ল্যাকমেলিং এর ঘটনা নজরে আসে। একই প্যাটার্ন।

অধিকাংশ ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে ফটো বা ভিডিও-র মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে DEEP FAKE প্রযুক্তির ব্যবহারও দেখা গেছে। (Deep Fake টেকনোলজি। এটা হল এমন এক টেকনোলজি যাতে কোনো ব্যক্তির ফটো বা ভিডিওকে অন্য ব্যক্তির ফটো বা ভিডিও বলে চালানো যায়। এই প্রযুক্তি প্রতারণার কাজেই ব্যবহৃত হয়।

Deep fake technology ব্যবহার করে child sexual abuse matinal, celebrity porn video, revenge porn, fake news, hoaxes এবং Financial fraud করা হয়।)

অপরাধীরা এক্ষেত্রে ফটো বা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেওয়া, আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, অথবা পর্ন (Porn) সাইটে আপলোড করে দেওয়ার ভয় দেখায়।

অন্য কিছু কৌশলও তারা নেয়। প্রথমদিকে ফেসবুক প্রোফাইল টার্গেট করা হতো। বর্তমানে ইনস্ট্রাগ্রামকে টার্গেট করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্র বলছে কিছু অর্গানাইজড গ্যাং এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। ২০২১ এর সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্থানের একটি গ্যাং ধরা পড়ে।

এছাড়া পূর্ব পরিচিত প্রাক্তন প্রেমিক বা প্রেমিকা পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসা নিতে এই ধরনের কাণ্ড কিছু ক্ষেত্রে ঘটিয়ে থাকে। তবে এ সংখ্যা নিতান্তই সীমিত।

সিআইডি জানাচ্ছে অসংখ্য ফেক প্রোফাইল খুলে এই কাণ্ড করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডেটিং সাইট গুলির ব্যবহার করে।

CID এবিষয়ে অ্যাডভাইজারি জারি করেছে। প্রথমত, অজানা নম্বরের ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট গ্রহণ করবেন না।

দ্বিতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাইভেসি কন্ট্রোল ব্যবহার করুন।

তৃতীয়ত, কোনো ঘটনা ঘটলে সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনকে জানান।

চতুর্থত, অপরপ্রান্ত থেকে ঘনিষ্ঠতা তৈরির চেষ্টা করা হলে সতর্ক হোন।

পঞ্চমত, প্রাইভেট ফটো, ভিডিও শেয়ার করবেন না। ষষ্ঠত, তবু এদের শিকার হলে পুরো ডিটেলস, স্ক্রিনশটস অফ কনভার্সেশন, প্রোফাইল প্রভৃতি পুলিশের কাছে দিন। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজ ৭ নভেম্বর ২০২২)।

১৭ অক্টোবর ২০২২ ইন্ডিয়া টুডে জানাচ্ছে রাজস্থানের একটি গ্রামের প্রায় সবাই এই র‍্যাকেটে যুক্ত। হরিয়ানা-রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশের সীমা সংলগ্ন মেবাট-আলোয়ার-ভরতপুর এই সমস্ত লোকালিটি এই ধরনের র‍্যাকেটের প্রধান এলাকা। বিশেষ করে মেবাটের মিও মুসলমান ট্রাইব এক্ষেত্রে কুখ্যাত।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৯-৩-২০২২, দা প্রিন্ট ২৪-১১-২০২২, দা হিন্দু ২২-০৪-২০২২ সহ দেশের প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এই ধরনের সেক্স রিলেটেড ব্ল্যাকমেইল এর খবর গত এক বছর ধরে করে আসছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কি হুঁশ ফিরছে?

সেক্সটর্শন ইজ নাথ নাথিং বাট সেক্স প্লাস এক্সটরশন। এই অপরাধ রুখতে সরকার ও তার ইন্টেলিজেন্স এবং বর্তমান আইনী কাঠামো কি যথেষ্ট?

প্রথমে আইনের বিষয়টি নিয়ে বলা যাক:

There has been some laws

1. Sexual harassment of women at workplace act 2013

2. Section 354 of IPC, protection against sexu-

al assault
3. Section 376 punishing rape
4. Section 384 of IPC, law against extortion
5. The protection of children from sexual offences act 2012
6. IT act 2000 stipulate sexual offences dealing with cyber crime.
But above mention laws and sections of IPC doesn't cover the sextortion or sex related extraction in cyber criminal offences.

উপরে উল্লেখিত আইন এবং আইপিসি ধারাগুলি এ ধরনের সেক্স রিলেটেড তোলাবাজি রুখতে পর্যাপ্ত নয়। উক্ত আইনগুলিতে তোলাবাজি, ক্রিমিনাল ইন্টিমিডেশন, মানহানি ইত্যাদি বিষয়গুলিতে অপরাধীদের অভিযুক্ত করে পানিশমেন্ট দেবার ব্যবস্থা থাকলেও অপরাধের গুরুত্বের সাথে সেই ধরনের সাজা বা পানিশমেন্ট এর অনুপাত অত্যন্ত অসামঞ্জস্য যার ফলে অপরাধীরা খুব সহজেই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারছে। দ্বিতীয়ত, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে সরকারের কাছে সাইবার বিশেষজ্ঞ, ইন্টেলিজেন্স বিভাগ, অপরাধ বিশেষজ্ঞ সহ যাবতীয় পরিকাঠামো রয়েছে তা সত্ত্বেও গত দুই তিন বছর ধরে যেভাবে, যে মাত্রায় সেক্স রিলেটেড তোলাবাজি এবং তজ্জনিত কারণে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছে সেটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় হচ্ছে না। এতে করে এ সংশয় অনেকেই প্রকাশ করছেন যে সরকার কি আদৌ চায় এ ধরনের ক্রাইম কে শেষ করতে? সন্দেহ জাগে।

সরকার কী করতে পারে?

প্রথমত, নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পুরনো আইন সংশোধন করে নতুন প্রভিশন সংযুক্ত করতে পারে।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট আইন তৈরি করতে পারে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। এর জন্য বিজ্ঞাপন সেমিনার টিভি শো ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। আইপিসি সেকশন ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫ ধারায় তোলাবাজির বিরুদ্ধে আইনি প্রভিশন আছে। আই পি সি ৪৯৯ ও ৫০০ ধারার মাধ্যমে ডিফেমেশন অর্থাৎ মানহানির মামলার পভিশন আছে। আই পি সি ৫০৩ ৫০৬ ও ৫০৭ ধারায় ক্রিমিনাল ইন্টিমিডেশন এর বিরুদ্ধে প্রটেকশন আছে।

কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপগুলি কি সরকার নিতে ইচ্ছুক? যদি ইচ্ছুক হত গত দুবছরে এই জাতীয় অপরাধ অনেক কম হতো। কমা দূরের কথা ক্রমশ বাড়ছে।

আসলে রক্ষণকামী ক্ষমতা তস্য সংক্রামিত অপরাধের কি মূলোচ্ছেদ করতে চায়? তা চাইলে সে আর রক্ষণকামিতা থাকেনা।

হরিয়ানা ও দিল্লির সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড

কিংশুক সন্ন্যাসী

অঙ্কিতা ভাণ্ডারী ১৯ বছরের তরতরে যুবতি। হৃষিকেশের একটি রিসর্টে রিসেপসনিস্টের কাজ করত। ১৮ সেপ্টম্বরের ২০২২ এর পর থেকে অঙ্কিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। ২৫ সেপ্টেম্বর একটি খাল থেকে তার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে।

হৃষিকেশের এইমসে তার দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় সে জলে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায়। শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ থেকে অনেকে অনুমান করছেন প্রথমে ধর্ষণ করে পরে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এই হত্যা কাণ্ড ঘটল? যে রিসর্টে অঙ্কিতা রিসেপশনিস্ট ছিল, তার মালিক বিজেপি নেতা বিনোদ আর্যের ছেলে পুলকিত আর্য। অঙ্কিতা নিখোঁজ হওয়ার আগে তার এক বন্ধুকে ফোনে জানিয়ে ছিল, রিসর্টে আসা বিশেষ অতিথিদের বিশেষ সেবা দেওয়ার জন্য রিসর্টের মালিক ও ম্যানেজার তার উপর চাপ দিচ্ছিল।

অঙ্কিতার খুনের দায়ে রিসর্টের মালিক পুলকিত আর্য, ম্যানেজার সৌরভ ভাস্কর ও সহকারি ম্যানেজারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট না পাওয়া অব্দি অঙ্কিতার অভিভাবক ও আত্মীয়রা দেহ দাহ করার অনুমতি দিচ্ছিলনা। অবশেষে প্রশাসনের বারবার অনুরোধে দেহ সৎকারের সম্মতি জানায়।

উত্তরাখণ্ড সরকার এই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি বলেন দোষীরা কেউ ছাড়া পাবেনা। অন্যদিকে রিসর্টটি উত্তেজিত জনতা ভেঙে ফেলেছে বলে খবরে প্রকাশ। কেউ কেউ মনে করেন খুন ও ধর্ষণের অনেক নমুনা সেখানে পাওয়া সম্ভাব ছিল। বিজেপি নেতা নিজেই তা ভেঙে ফেলেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

যুবতির পরিবার দরিদ্র। রিসর্ট মালিক বড়ো নেতার ছেলে। বড়ো নেতা। বড়ো মাথা। সম্পত্তির পরিমাণও নিশ্চয় বড়ো। জনগণ এই নেতাদেরই ভোট দিয়ে নির্বাচন করে। যাতে তারা জনতার অধিকার আদায় করবে। না হলেও কমবেশি সামাজিক নিরাপত্তা দিবে। কেমন হলো বিষয়টি? বেড়ালকে মাছ যোগাতে দিচ্ছি। সে আমাদের তাস পাশা খেলার মতো ব্যবহার করছে। কোথায় অধিকার? কোথায় সামাজিক নিরাপত্তা? নির্বাচিত নেতারা কী করছেন? তারা সমাজ, দেশ, নাগরিক, নাগরিকদের অধিকার, নিরাপত্তা সবকিছুকে তুড়ি মেরে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। কুক্ষির ধন দিয়ে বানাচ্ছে নেশার চোখ ধাঁধানো রঙিন জগত। তাতে নাগরিকের মগজ ধোলাই এর জন্য খুলছে রিসর্ট, পানশালা, বার ইত্যাদি।

পানশালাতে সুন্দরী যুবতির প্রয়োজন। নারীর সৌন্দর্য্যকেও বিপনির কাজে লাগানো যায়। প্রয়োজনে তাদের দেহকে কেউ কাজে লাগাতে ছাড়েনা। সবই তো পণ্য। নারীও পণ্য। নারীর দেহ পণ্য। টাকা দিবো। নারী ও তার দেহ পণ্যের মতো পেয়ে যাবো। টাকার কাছে সকলেই ব্রিক্রি হয়। কিন্তু অঙ্কিতা বিক্রি হতে চায়নি। সে নিজেকে পণ্য গণ্য করেনি।

কেন করবেনা? এত সাহস! সে তো দু পয়সার রিসেপশনিস্ট। পণ্য না হলে ব্যবস্থা অন্য। হুমকি। ব্ল্যাকমেইল। ধর্ষণ ও হত্যা। কাহিনিটি খুব দুর্ভেদ্য কি? পুলিশ, জেল, আদালত কি অর্থ-ক্ষমতার বাইরে? কিন্তু কেন যে অঙ্কিতার মতো পাগল মেয়েরা টাকাটা চিনলো না!

রক্ষণকামী ক্ষমতার সাথে খুন ধর্ষণ আর নারীর পণ্য হওয়া ওতপ্রোত যুক্ত। প্রশ্ন হল এই পাপকে পাপ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে চাইছি কি? যদি চিহ্নিত করি তাহলেই প্রতিকারী পরবর্তী ধাপ এসে হাজির হতে পারে! সে অন্য অধ্যায়! আশু প্রশ্ন অতঃপর কোন ক্ষমতা অশান্তির আগুন জ্বালায় আর কোন ক্ষমতাই বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে? ভাবার সময় কি এখনও হয় নি?

শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ড

আফতাব আমিন মুম্বাই এর একটি কল সেন্টারে চাকুরি করত। ২৮ বছর বয়সী যুবক। ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ওয়াকার নামে ২৬ বছরের যুবতির সাথে পরিচয় হয়। পরে একই কল সেন্টারে কাজ। ইনটিমেসি । লিভ ইন।

শ্রদ্ধার পরিবার আপত্তি জানায়। শ্রদ্ধার বন্ধুদের কাছ থেকে জানা যায় যে, শ্রদ্ধাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত আফতাব। শারীরিক আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায় ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ছবি থেকে।

দক্ষিণ দিল্লির একটা আবাসনে ওরা থাকত। অত্যাচার সত্ত্বেও শ্রদ্ধা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না। যদিও একবার সে পুশিলের কাছে অভিযোগ করেছিল। তার বন্ধুদেরও বলেছিল যে, আফতাব তাকে খুন করে ফেলতে পারে। বন্ধুরা মাঝে মধ্যে সরিয়ে আনলেও সে নিজেই আবার তার কাছে ফিরে গেছে। আফতাব আত্মহত্যার করবে বলে ব্ল্যাকমেইলও করত। সে এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। একবার সে মুম্বাই তার বাবার কাছে চলেও গিয়েছিল। আবার সে ফিরে আসে।

বন্ধুরা জানায় যে এই বছরের মে মাস পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে যোগাযোগ ছিল। তারপর থেকে তারা আর কোনো খবর পাচ্ছিল না। তারা শ্রদ্ধার বাবাকে জানায়। শ্রদ্ধার বাবা পুলিশে আফতাবের বিরুদ্ধে কেস করেন। পুলিশ নভেম্বর ২০২২, আফতাবকে গ্রেপ্তার করে। জেরায় আফতাব স্বীকার করে ১৮ মে ২০২২ কলহকালীন আফতাব শ্রদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পরে ঠান্ডা মাথায় তার দেহ ৩৫ টুকরো করে কেটে নতুন ফ্রিজ কিনে ভরে রাখে। পলিথিনের প্যাকেটে করে পাশের একটি জঙ্গলে সুযোগ মত তার বেশ কিছু প্যাকেট ফেলে আসে। বাড়িতে রক্তের কোনো চিহ্ন সে রাখেনি। এমনকি সেই ঘরেই সে ছয় মাস ধরে বাস করছিল। সেখানে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়েও আসত। নেট থেকে এই সকল কাজ কী করে করতে হয় তা জেনেছিল। পুলিশ উদ্ধারকৃত দেহাংশ ফরেন্সিক তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সেই রিপোর্ট পেলে কার দেহাংশ তা পরিষ্কার হবে। পুলিশ অনুমান করছে ত্রিকোণ প্রেম থেকেই এই হত্যা কাণ্ড।

কেন এই পৈশাচিক খুন? এর ব্যাকগ্রাউণ্ডে কোন মানসিক বিকৃতি কাজ করেছিল? ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার কোন রক্ষণকামিতা কাজ করেছিল? একটু কাটাছেঁড়া করা যাক—

১।

নর-নারীর ভালোবাসার সম্পর্ক স্বাভাবিক সম্পর্ক। কিন্তু তা কেবলমাত্র ভালোবাসাতে নিবদ্ধ থাকেনা। কারণ সত্তার অতল তলে আমরা সবাই রক্ষণকামী। সেই রক্ষণকামিতায় আমরা একে অপরকে নিজ নিজ সম্পত্তি মনে করি। আর পাঁচটা ব্যক্তিমালিকানার সম্পত্তির মতই। অতএব রক্তমাংসে আলাদা একটি সত্তার অধিকারী হলেও সেখানে বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরতে থাকি। বলতে থাকি তুমি আমার। অন্য কারোর নও। অন্যের সাথে তোমার ভালোবাসার আর কিছু থাকতে পারেনা। সমস্ত ভালোবাসা আমার জন্যই থাকবে। এই সব বাউণ্ডারিতে বেঁধে ফেলি। সমস্যা শুরু হয় সেখান থেকেই। এই জোড়ের বাইরে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যুগল দ্বয়ের কেউ কোনো প্রকার সম্পর্ক, যোগাযোগ করলেই বিবাদ শুরু হয়। সেখান থেকেই আসে একজন অন্য জনকে সম্পূর্ণ দখল করার মানসিক বিকার। যে বিকারের কোনো সীমা নেই। হত্যা,

আত্মহত্যা, বিচ্ছেদ ইত্যাদির মতো হত্যা, আত্মহত্যা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি অপঘটনার সংক্রমণ ঘটে। সন্দেহের বীজ একবার ঢুকে গেলে আর কোনো কথা নেই। সেটাই তখন কুরে কুরে খেতে থাকে। সম্পর্ক যতই আবেগঘন ও মধুর হোক, ঐ বিষ সারা শরীর ও চেতনা তথা মনকে কবজা করে ফেলে।

২।

সম্পর্কে থাকা যুবক-যুবতি দুজন একটা নতুন ফর্মে বসবাস করছিল। কিন্তু সেই ফর্মটি (লিভ ইন) আর্থসামাজিক শ্রম সম্পর্কের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়নি। তা আরোপিত। রক্ষণকামী বিশ্বায়নের মাধ্যমে পশ্চিমি জড়-উৎকেন্দ্রিক জীবনের সংক্রামিত উপসর্গ।

পশ্চিম জাত এই লিভ ইন সম্পর্কের ভিত্তিটি কী? দায় দায়িত্ব বিহীন যৌনতা যাপন! কেন এই দায়িত্ব এড়াতে চাওয়া?

এর দুটি উত্তর। এক, রক্ষণকামী আর্থসামাজিক জাতাকল থেকে রেহাই পেতে চাওয়া। যা আসলে ভুক্তভোগীকে রেহাই দেয় না। আরো নানান ঝামেলা সংক্রমণ করে।

দুই, কেবলমাত্র চুক্তিভিত্তিক যৌনতা চরিতার্থ করবার জড়ভোগী বিকার থেকে। এইটা সরাসরি বিশ্বায়ন নির্ভর জীবন ব্যবস্থার জাতক!

৩।

বিশ্বায়ন নির্ভর কর্পোরেট জীবন ব্যবস্থা কীভাবে এই যৌনজীবন তথা সমাজকে বিকৃত করছে যে বিকৃতি আফতাব আমিনের মত ভয়ানক নৃশংস খুনির জন্ম দিতে পারে!

উল্লেখ্য যে রক্ষণকামী মুক্তবাজারী জীবন ব্যবস্থা আর্থসামাজিক সম্পদকে ব্যক্তি কুক্ষীতে বন্দি করে। পরিণামে সমাজের বিকাশগত ব্যালেন্স বিগড়ে যায়।

বিগড়ানো আর্থসমাজ তখন রকমারি বিকৃতির সূতিকাগার। যার অন্যতম যৌন বিকৃতি! এই বিকৃতি সমাজ মানসে এমনভাবে ঢুকে যায় যে বিকৃতির রুট কীভাবে কত দূরে যায় এবং আফতাব আমিনের মতো নৃশংস নরখাদকদের জন্ম দেয়, তার ধরাবাঁধা কোনো ছক নেই।

কথার শেষ

সামন্ততান্ত্রিক আর্থসমাজ ব্যবস্থাপনায় যেমন জমিদার নায়েব ইত্যাদি লোকাল তাঁবেদারদের গোলায় উৎপাদিত সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যেত। সেই সেন্ট্রালাইজেশন অফ ওয়েলথ এর পরিণামেই বাগানবাড়ি- বাইজিবাড়ি- জলসা বাড়ি- বেশ্যাবাড়ি কতই না যৌন বিকৃতির আর্থসামাজিক বহিঃপ্রকাশ! সামন্ততন্ত্র পেরিয়ে পুঁজি সেই জায়গা গ্রহণ করার সাথে সাথে নগরভিত্তিক জীবনের অনিবার্য উপসর্গ হিসেবে যৌন বিকৃতি যৌন ব্যবসা-রূপে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রূপে গড়ে ওঠে। আর তা গড়ে তোলার ব্যাপারটা ডাল ভাত হয়ে যায়।

অনুরূপ লিভ ইন ব্যবস্থাপনা পশ্চিমের জড় সভ্যতা থেকে জন্ম নিয়ে বিশ্বায়নের হাত ধরে উপমহাদেশে প্রবেশ করে। আগে যা মূলত সমাজের অভিজাত কর্ণারে লক্ষ্য করা যেত তা এখন শহুরে হোয়াইট কালার ওয়ার্কারদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। সামন্ত ব্যবস্থাপনাতেও যেমন আর্থসামাজিক ক্ষমতা রক্ষণকামের খপ্পরে ছিল, শিল্প বিকাশে পুঁজির প্রাধান্যে সেই ক্ষমতাও রক্ষনকামের খপ্পরে পড়েছিল, আর আজ কর্পোরেট বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় সেই আর্থসামাজিক ক্ষমতা সেই রক্ষণকামী খপ্পরেই বহাল তবিয়ত।

এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, এক ধারাবাহিক বিকৃতির নেতিবাচক প্রবাহ যেন অনন্ত কাল ধরে প্রবাহিত হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে। এই না বাচক প্রবাহ থেকে ব্যক্তি তথা আর্থসমাজকে মুক্ত করে মুক্ত ধারা প্রবাহিত করে দেবার দৃষ্টান্তও কিন্তু মানবজাতি রেখেছে! সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সে ইতিহাস গড়বে নাকি বিকৃতির পাক ঘাঁটতে থাকবে, তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে

রাষ্ট্রের ওয়েলফেয়ার কর্মীদের শোষণ: আশা (ASHA)/ অঙ্গনওয়াড়ি ইত্যাদি

প্রাচী হক (Hawk)

'রাষ্ট্রীয় ওয়েলফেয়ার রূপায়ন করে যারা,
রক্ষের ক্যাজুয়াল তকমায় মরে তারা!'

দেশজুড়ে নারী ও শিশুর পুষ্টি প্রকল্প কারা ডেলিভার করছে?

—অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা।

জাতীয় গ্রামীন স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় (NRHM) দেশব্যাপী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নেটওয়ার্কের কিংপিন কারা?

—আশা (Accredited Social Health Activist) ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানো ও সংশোধনমূলক শিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষণ-যত্ন নিচ্ছে কারা?
—সর্বশিক্ষা মিশনের আওতায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (SSK), মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (MSK) এর সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে নিযুক্ত পার্শ্ব শিক্ষকরা।

২০২২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশা কর্মীদের Global Health Leader পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এই আশা কর্মীরাই উত্তর প্রদেশে, এই তো কদিন আগে, নিজেদের সামান্য কিছু দাবী দাওয়ার কথা বলতে গেলে পুলিশ তাদের একশো জনকে গ্রেপ্তার করে। কেস দেয়। সেই পুলিশ অর্থাৎ রাষ্ট্র আবার তাদেরকেই Hero, Covid Warrior, Front line Worker, Community Organizer ইত্যাদি ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করেছে। দেশের প্রতি তাদের এই 'Sacrifice' অতুলনীয় বলে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করলো।

১৯৫৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশনা দিয়েছিল যে, পলিসি নির্ধারণে লেজিসলেশনের (আইন প্রণয়ন) প্রয়োজন নেই, এক্সিকিউটিভরাই তা করতে পারে। এই নির্দেশনাতেই নিহিত এমন এক ধরণের পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির ব্যবস্থাপনা যা আসলে আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রের খেয়াল খুশি করার ব্যবস্থাপত্র মাত্র! Executive Notifications, Govt. orders, Scheme guide-lines ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ওয়েলফেয়ার স্কিম পরিচালনা করা হয়। যেমন ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের আওতায় Accredited Social Health Activist (ASHA)। যাকে গালভরে বলা হয়েছে One leg of the backbone of health care in India। ২০০৫ সালে চালু হয়ে প্রাথমিক লক্ষ্য মাত্রা ২০১২ নির্ধারণ করা হয়েছিল। জুলাই ২০১৩ র হিসাবে 'প্রতিটি গ্রামে আশা' এই লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এদের প্রধান কাজ হল **প্রান্তিক মানুষদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা**। অর্থাৎ শিশুর যত্ন, মায়ের স্বাস্থ্য, টীকাকরণ, বন্ধ্যাত্বকরণ শিক্ষা, ভ্যাকসিনেশন সার্ভে ইত্যাদি প্রভৃতি। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আশা কর্মীর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষেরও বেশি। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ৯ লক্ষ ৪০ হাজার। বর্তমানে এই সংখ্যা ১ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লক্ষ অতিক্রম করেছে। সরকারি হিসেবে প্রতি ১ হাজার জনসংখ্যা পিছু ১ জন করে আশা কর্মী থাকার কথা। প্রতি মাসে এদের স্যালারি, না স্যালারি নয়, অনারেরিয়াম প্রায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা।

এই পরিসরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কথাও উল্লেখ করা দরকার। ২রা অক্টোম্বর ১৯৭৫ সালে উচ্চ মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, কমিউনিটি এডুকেশন, প্রি স্কুল নন ফরমাল শিক্ষা, টীকাকরণ এবং রেফারেল সার্ভিসেস ইত্যাদি

কাজের লক্ষ্য মাত্রাকে সামনে রেখে আইসিডিএস কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এর প্রেক্ষাপটে ছিল অপুষ্টি, স্বাস্থ্যের বেহাল দশা, মা ও শিশু মৃত্যুর উচ্চ হার। তারপর প্রায় ৫০ বছর হতে চলল। বর্তমানে সারা দেশব্যাপী আইসিডিএস কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৭ থেকে ২৮ লক্ষ। তারা দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অপুষ্টি, স্বাস্থ্য, মা ও শিশুর পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি কাজ নিরলসভাবে করে চলেছেন। আরো অনেক কম মজুরি থেকে শুরু করে বর্তমানে আইসিডিএস ওয়ার্কার মাসিক অনারেরিয়াম পান ৪৫০০ টাকা এবং আইসিডিএস হেল্পার পান মাসিক ৩৫০০ টাকা। এটি হলো কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন ভাতা বা অনারেরিয়াম। বিভিন্ন রাজ্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে এর থেকে অনেক বেশি স্যালারিও দিতে পারেন। নতুন লেবার কোড ২০২০ অনুযায়ী আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ারকাররা মিনিমাম মজুরি থেকেও বঞ্চিত। তাদেরকে সোশ্যাল ওয়ার্কার বা ভলেন্টিয়ার ওয়ার্কার তকমা দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ছাড়াও আরো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন অথচ তারা রেগুলার ওয়ার্কার নন।

সারাদেশব্যাপী প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে নানান ধরনের রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক পরিষেবা এ সমস্ত কর্মী ও সহায়িকারা দিয়ে থাকেন।

এতদ সত্ত্বেও গত ৫০ বছরের পরেও এই সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলির ৩৬ শতাংশে কোন টয়লেট নেই। সিংহভাগের কোনো পানীয় জল ফেসিলিটি নেই।

এটা ঘটনা যে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক কম হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি এই কর্মসূচির সবথেকে বড় সাফল্য। কিন্তু তবু ২০১৬-১৮ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক কম্প্রেহেনসিভ ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভে থেকে জানা যাচ্ছে দেশের ৩৫ শতাংশ শিশু (৫ বছরের কম বয়সী) খর্বাকৃতির। ৩৩ শতাংশ শিশু আন্ডার ওয়েট এবং ১৭ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। অর্থাৎ এই প্রোগ্রামের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট। বরঞ্চ এই প্রোগ্রামকে যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ঘাটতি রয়েছে তার অন্যতম হলো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের যথার্থভাবে যোগ্যতা মান বাড়ানো। তাদের প্রশিক্ষণ। তাদের জীবিকা অর্থাৎ যথার্থ মজুরি ও কর্ম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সেটি না করে তাদের মাধ্যমে সামগ্রীগুলি বিতরণ নিয়ে তারা দুর্নীতি করে এ কথাটি প্রচার করা হয়। এবং চরিত্র হনন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে তার বরাদ্দ কমিয়েও দিচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ ভাগ এবং রাজ্য সরকার ১০ ভাগ অর্থ ব্যয় করবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও বর্তমানে তা সিক্সটি ফোরটি রেশিওতে বিভক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্র ক্রমশ তার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চায়ছে। এখন কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেই ৯০:১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি চালু আছে।

সর্বশিক্ষা মিশনের আওতায় SSK, MSK স্কুল খোলা হয়েছে। সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে শিশুদের Remedial Teaching ও ড্রপ আউট কমানোর জন্য Para Teacher পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা এবং পার্শ্ব শিক্ষকদের ন্যূনতম মজুরি ছাড়াই স্কিম ওয়ার্কার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ওরা ন্যূনতম মজুরি পাবে কেন? ওরা কি শ্রমিক? ওরা কি কর্মী? না, ওরা যে স্কিম ওয়ার্কার! ওরা তো আর সরকারি কর্মী নয়। ফলে তাদের স্যালারি, তাদের পরিকাঠামো, তাদের দাবি, তাদের অধিকার এসবগুলি থাকতে নেই!

অর্থাৎ এরা হলেন অনারারি ভলান্টিয়ার (Honorary Volunteer) যাতে এদের কোনো দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে

না হয়, এমনকি ন্যূনতম মজুরি (মিনিমাম ওয়েজ) পর্যন্ত দিতে না হয় এই জন্য এই তকমা! এই কর্ম নিয়োগ মডেল অত্যন্ত বিপদজনক। যেমন উত্তর প্রদেশে শিক্ষামিত্র, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বন্ধু, প্রাণী মিত্র, কৃষক বন্ধু প্রকল্পের কৃষক বন্ধু ইত্যাদি। আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের যাতনা দীর্ঘকালীন পরিচিত। আসলে এদের সমস্যাটি কেবল এদের প্রতি বঞ্চনা নয়। এটা একটা এমপ্লয়মেন্ট মডেল কে ইন্ডিকেট করে। যে মডেলটিকে বলা যায় ডেলিবারেট ফর্ম অফ ক্যাজুয়ালাইজেশন অফ লেবার (Deliberate form of casualization of labour) যেখানে এক্সিকিউটিভরাই এসবের নিয়ন্তা।

স্কিম ওয়ার্কার্সরা আজ স্বাস্থ্য-শিক্ষা-নারী-শিশু ক্ষেত্রগুলিতে প্রধানত যুক্ত। এরা সেই সব বিভাগগুলিতে আছেন যেখানে রাষ্ট্র জনকল্যাণের কিছুটা দায়িত্ব পালন করে।

এই ধরনের কর্মীদের পারস্পরিক সাদৃশ্য হল—

১। এরা রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কাজ করে এক্সিকিউটিভ নোটিফিকেশন এর আওতায়।

২। রাষ্ট্র এমনভাবেই স্কিম স্ট্রাকচার রচনা করেছে যাতে করে কোনো শ্রম আইনের আওতায় না আসে। এরা সরকারের স্থায়ী কর্মীদের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলালেও এরা 'Workers' এই পদবাচ্যটিরও হকদার নয়। সেই জায়গায় এদের 'honorary/ volunteer' position holder' বলা হয়। বলা হয় community organizer/ worker ইত্যাদি! ফলে এদের wage বা মজুরি প্রদানের দায়ভার ঝেড়ে ফেলে সরকারগুলি honorarium প্রদান করে। এইভাবে এদের কাজ হল 'honorary job'। ব্যাপারটা এমনি করেই establish করা হয় যাতে তাদের workmen হিসেবে চিহ্নিত করা না যায়। ফলে তারা Industrial Dispute Act এর আওতার বাইরে থেকে যায়।

এর ফলে আরেকটি ঘটনা ঘটে। মিনিমাম ওয়েজ থেকেও কম মজুরি এদের দেওয়া যায় অনায়াসে। সম্প্রতি অনুরূপ একটি স্কিমে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মিড-ডে-মিল কর্মীদের অতি তুচ্ছ অনারেরিয়ামের বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছে। 'বলেছে' ব্যাপারটা অনেকটা অনুরোধের মতই। কোনো আইন নেই। অর্থাৎ সরকারের বাধ্যতা নেই।

ক্ষমতাধর আমলা তথা নিয়োগকর্তারা নিয়োগের ক্ষেত্রেও এদের ১১ মাসের কম সময়ের জন্য নিয়োগ দেয়। Industrial Dispute Act এর আওতায় আসতে গেলে ২৪০ দিন একটানা সপ্তাহে ৫ দিন সার্ভিস করতে হয়। নিশ্চত করা হয়, যাতে এই প্রটেকশনের আওতায় তারা না আসতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্কিমগুলি প্রায়শই Executive Orders and Decision এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যা আইনী অধিকারের বিষয়টিকে সামনে আনতে দেয় না। বা আইনী ঘেরাটোপের বাইরে রয়ে যায়। ফলে আইনগত উপরিকাঠামোর অভাবে বিচার বিভাগ তাদের শ্রম আইন সংক্রান্ত প্রটেকশন দিতে পারে না। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার একটি পর্যায়ে আইসিডিএস কর্মীদের Food Security Act, 2013 এর আওতায় গ্রাচুইটি দেবার বিষয়টি ফয়সালা করেছে। ফলে আইসিডিএস কর্মীরা এইটুকু আইনগত প্রটেকশন পায়। আশা ওয়ার্কাররা সেটুকুও পায় না। ২০১১ সালে NRHM এর কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান National Health System Resource আশা প্রকল্প নিয়ে ২২৪ পৃষ্ঠার একটি মূলায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সেই প্রতিবেদন আশা কর্মীদের Working Condition এবং বঞ্চনার বিষয়টি নিয়ে একটি পাতাও

ব্যয় করেনি। যদিও ওই প্রতিবেদনে এটিও উল্লেখিত ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের আশা কর্মীদের ৯১% , রাজস্থানের ৮০% , অন্ধ্রের পূর্ব গোদাবরি জেলার ৫১% (এখানে সরকারের ফিক্সড পেমেন্ট সিস্টেম আছে), বিহারের ৮৩%, আসামের (করিমগঞ্জ জেলার) ৭৫%, কেরালার ৫৭%, ওড়িশার ১৯% এই কাজকেই তাদের উপার্জনের প্রধান সোর্স বলে উল্লেখ করেছেন।

কেবল মাত্র তাদের কাজের 'Volunteer nature' এর অজুহাত দিয়ে রাষ্ট্র তাদের নূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। এবং তা honorary এই Typology ব্যবহার করে তাদের 'শ্রম' অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিতে বাধা দিয়ে আসছে। এদের নিয়োগটা Casualization এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এর মূল লক্ষ্য হল নিয়োগ কর্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রের খরচ কমানো যার মাধ্যম হল স্বল্পমেয়াদী চুক্তি শ্রম। নিয়োগ কর্তার থেকে কর্মীদের দূরত্ব তৈরি করা। এর মাধ্যমে তাদের পিএফ, গ্রাচুইটি, ছুটি, কর্ম নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় থেকে নিয়োগকারী অর্থাৎ রাষ্ট্র মুক্তি পেয়ে যায়!

স্কিম ওয়ার্কাররাই তাদের কাজের মাধ্যমে গ্রামীন স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, শিশুর পুষ্টি, শিক্ষা, ওয়েলফেয়ার বেনিফিট বিতরণ ইত্যাদিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মী। তারা রজনীতিবিদ, আমলা, অফিসার ইত্যাদির অধস্থানে থেকে তাদের হুকুম বরদার হয়ে ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি সেই রাষ্ট্রের সবচেয়ে দুঃস্থতম নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

অথচ রাষ্ট্র তাদের সম্মানজনক জীবিকা দিতে নারাজ। আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির একটি সার্ভে থেকে জানা যাচ্ছে ১৯% সমীক্ষাকৃত হেলথ কেয়ার কর্মী জানিয়েছে মহামারির সময় তাদের ব্যক্তিগত প্রপারটি বিক্রি বা বন্ধক রাখতে হয়েছিল! এ এক ভয়ঙ্কর প্রহসন!

তাদেরকে বলা হল হিরো, যোদ্ধা, তাদের কাজকে বলা হল sacrifice। এগুলি করা হল তাদের কাজের ধারাবাহিকতা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে। নিয়মিত করণ হতে না দেবার জন্যই তো এই হিরো ব্যঞ্জনা আর আত্মত্যাগের মহিমা প্রচার করা!

২০১১ সালের মূল্যায়ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে,

১। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় কমিউনিটি সার্ভিসে আশা কর্মীরা অগ্রবর্তী ভূমিকা নেয়।

২। তারা আসে মূলত আর্থিক কারণে।

৩। তারা ভাবে তারা সরকারী কাজের সুবিধা পাবে।

তারা তাদের কাজে বরাবর চ্যাম্পিয়ন হতে থাকে, হতেই থাকে। কিন্তু কর্ম নিরাপত্তা (job security), কর্মচারির অধিকার (employment benefit) ও ন্যূনতম মজুরি (minimum wage) ইত্যাদি থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। 'Community Service' টাইপোলজি দিয়ে এই বঞ্চনাটা জিইয়ে রাখা হয়! কিন্তু কত দিন!

গ্রন্থ সমালোচনা

পার্থ ব্যানার্জির দানবের পেটে দুই দশকঃ সমকাল ক্ষমতার চরিত্র নামা

শ্রীচেতনিক

মার্কিন প্রবাসী লেখক জানিয়েছেন ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বেলি অফ দা বিস্ট' গ্রন্থের ঈষৎ পরিবর্তিত বাংলা অনুবাদ 'দানবের পেটে দুই দশক' এই গ্রন্থটি। দুই দশকের প্রাক্তন সংঘকর্মী হিসেবে লেখকের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোন সংশয় থাকে না।

লেখকের একাডেমিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পরিচয় তাঁর বর্তমান পেশাগত পরিচয়টি নানাভাবেই সেদেশে প্রকাশিত। তিনি একাধারে মানবাধিকার কর্মী, লেখক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, সঙ্গীতকার! কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বায়োলজির মাস্টার্স, মার্কিন দেশে একই বিষয়ে মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রি। পুনরায় সাংবাদিকতায় মাস্টার্স। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও মুক্ত চিন্তার প্রবক্তা নোয়াম চমস্কিকে গুরু মানেন।

বাংলা এই বইটি প্রকাশ করেছেন পিপলস বুক সোসাইটি। পিপলস বুক সোসাইটির ডাক্তার সুমিতা দাস বইটি অনুবাদ করেছেন। সুমিতা পেশাগতভাবে একজন ডাক্তার হলেও দীর্ঘদিন গবেষণা ও লেখার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং সহজ পাঠ্য।

গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব সংঘ কী, কেন ও কীভাবে ইত্যাদির অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বর্ণনা এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ওভারভিউ। সংঘের কার্যকলাপ, তার সহযোগী সংগঠন শিবসেনা, এবিভিপি, বিএমএস প্রসঙ্গে আলোচনা এ পর্বে করা হয়েছে। এই পর্বে সংঘ কোন কোন উৎসবগুলিকে গুরুত্ব দেয়, প্রার্থনা ও একাত্মতা স্তোত্র উল্লেখ করেছেন। সেগুলি সংস্কৃত সহ বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। এ পর্বে লেখক নিজে অরাজনৈতিক (?) সংঘের হয়ে যেভাবে রাজনীতি করেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করেছেন। নারী প্রসঙ্গে, সাম্প্রদায়িক হিংসায় সঙ্ঘ ও শিবসেনার ভূমিকা এই পর্বে লেখক আলোচনা করেছেন।

গোটা বিশ্বজুড়ে ফ্যাসি-প্রবণ ও ডগমাটিক যে সমস্ত সংগঠন নানান অপকান্ড করছে সংঘ যে অনুরূপ কাজ এদেশে করে চলেছে এই অধ্যায়ের নবম অনুচ্ছেদে লেখক সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব জুড়ে বাবরি মসজিদ ও তিন দশকের পুরনো বিজেপি আর শেষে নতুন বিজেপি প্রসঙ্গ, বিজেপির নির্বাচন জয় ও ভারতে মার্কিন ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৯ এ পুনরায় তার ক্ষমতা লাভ সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

নোয়াম চমস্কির ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট অর্থাৎ সহমত আদায় তত্ত্বের আলোকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ১৪ নম্বর অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন একদিকে কর্পোরেট প্রভু, একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের সংঘ অনুসৃত উদ্ভট যুক্তি ও তথাকথিত ধর্মাশ্রিত চন্ড জাতীয়তাবাদ। আর তার সঙ্গে কর্পোরেট মিডিয়া ও তার দ্বারা জনতার মগজ ধোলাই। এর মাধ্যমে

কমনসেন্স নামক বস্তুগত যে মূলধন মানুষের চির অধিকারে থাকার বিষয় তার অধিকার মানুষ হারিয়ে ফেলছে প্রতিনিয়ত-প্রতিক্ষণ-প্রতিদিন। এই পদ্ধতিতেই সারা পৃথিবীতে আধিপত্যকামি ফ্যাসিপ্রবণ শক্তিশালী(?) শাসকদের বাজিমাত। তা রাশিয়ায় পুতিন এর নেতৃত্বে যেমন, তুরস্কে এরদোগান এর নেতৃত্বে যেমন, মার্কিনে ট্রাম্পের নেতৃত্বে যেমন, ফ্রান্সে ম্যাক্রোঁ নেতৃত্বে যেমন, ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেও তেমনি।

পরবর্তী অধ্যায়ে ২০১৯ নির্বাচন পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে লেখকের বিশ্লেষণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে দেশের নিরাপত্তা, বিদেশ নীতি, নাগরিকত্ব, ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন, সংখ্যালঘুদের গণহত্যা ইত্যাদি বিষয় তথ্যসহযোগে ও পরিশীলিত মননে বিশ্লেষিত হয়েছে। ১৮ তম অধ্যায়টিতে লেখক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

সারা পৃথিবীর অভিবাসন ও সেই সংক্রান্ত নীতি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। ভারতের জলবায়ু দূষণ কোন মাত্রা নিয়েছে এবং বর্তমান ক্ষমতা সেক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিচ্ছে সেটিও আলোচনায় উঠে এসেছে। এবং একেবারে শেষ অধ্যায় ২১ তম অধ্যায়ে 'আসল আলোচনাটি কোথায়' এই শিরোনামে আমাদের তথাকথিত মুক্তমনা বামপন্থী ও তাদের সংবাদ মাধ্যম কতগুলি সংবেদনশীল বিষয়ে যে ধরনের মনোভাব পোষণ করে থাকে, লেখক তার সমালোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মান্ধ মুসলমানদের সন্ত্রাস প্রসঙ্গ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, অবিশ্বাস্য গতিতে মুদ্রাস্ফীতি এবং দূষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন বামপন্থীরা এবং কংগ্রেস পার্টি জনতাকে দিশা দেখাতেই ব্যর্থ। তাদের এই ব্যর্থতা বর্তমান রেজিমকে আরো বেশি অপরাজেয় করে তুলেছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর নেপথ্য সুতোর টানে কতইনা ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত! আর এগুলো করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যমের সহমত আদায় করে নেওয়া অর্থাৎ মগজ ধোলাই এর মাধ্যমে।

প্রস্তাবনায় সঙ্ঘ পরিবার নিয়ে লেখক যে সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তাঁর কাছে অনৈতিক বলে মনে হয়েছে সেগুলি হল যথাক্রমে এক, 'ধর্মাশ্রিত' সাংস্কৃতিক পক্ষপাত ও একমুখীনতা। দুই, আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক হয়েও অরাজনৈতিক হওয়ার ভান করা। তিন, অন্যরকম সংগঠন হওয়ার দাবি করা। চার, খেলাধুলার নাম করে সামরিকীকরণের চেষ্টা। পাঁচ, কম বয়সীদের সংস্কৃতির নামে ধরে এনে সংস্কৃতির ছুতোয় মগজ ধোলাই করা। ছয়, নারী ও পুরুষকে আলাদা করা এবং নারী বিদ্বেষ। এবং সাত, তাদের ফ্যাসিবাদী আধিপত্যবাদী সাম্প্রদায়িক অপরকে (আদার) বাদ দিয়ে চলার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মতবাদ। লেখক এর মতে এ হচ্ছে সংঘের সাতটি পাপ।

তাদের অরাজনৈতিক হওয়ার ভান করাটা সর্বৈব মিথ্যা। আসল ব্যাপার যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতা দখল করা। অন্যরকম হওয়ার ভান করাটা একটা ভন্ডামি কারণ তাদের রাজনৈতিক উইং ভারতীয় জনতা পার্টি কংগ্রেস পার্টির মতোই হরেক অপরাধজনক কাণ্ডে লিপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদেরকে নিয়েই গঠিত। এরা প্রায় সকলেই উচ্চবর্ণের কনজারভেটিভ পুরুষ, ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী, আমলা বা পুরোহিত যারা চিরকাল ভারতে ক্ষমতার নেপথ্য শক্তি হয়ে থেকেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংঘ সামরিক ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রশ্নহীন-অজ্ঞ-অনুগত এক বাহিনী গড়ে তুলেছে যারা সংঘের আসল চরিত্র জানেও না, জানতেও চায় না। এখানে এই ধরনের বাহিনী এবং তাদের

র‍্যাশনালিটিবিহীন করে গড়ে তুলবার মধ্যে নাৎসী বাহিনীর এস এস গ্রুপের সঙ্গে অনেকেই একে তুলনা করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় এই ধরনের প্রশিক্ষিত অন্ধ আনুগত্যের বাহিনীকে কাজে লাগানোর অনেক দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে।

তাদের চিন্তাভাবনার মূল জায়গা জুড়ে রয়েছে সেন্টিমেন্টাল ধর্ম আধিপত্যের বিষয়টি। যা আসলে ঔপনিষদিক অর্থে ধর্ম নয়! আদপে যার ইতিহাসগত কোনো ভিত্তিও নেই। অসংখ্য জাতিভেদে, বর্ণভেদে বিভক্ত ভারতীয়দের কৃত্রিমভাবে তৈরি একটি ঐক্য-প্ল্যাটফর্মে একত্রে একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে বিদেশি 'ধর্মের' প্রতি ঘৃণার একটা ধারণা তৈরি করা হয়েছে। দলিত-বনবাসী ও সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সমর্থন পাবার জন্য বিরসা মুন্ডার মত নিচু জাতের বীরদের নাম সংঘ তার একাত্মতা স্তোত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু আসলে ব্রাহ্মণ্য বর্ণকাঠামো সে ভাঙতে চায় না। তারও দৃষ্টান্ত আছে।

লেখক জানাচ্ছেন সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ার এই ধারণা প্রচার করেন যে ভারতের সমস্ত অহিন্দু যেমন মুসলিম ও খ্রিস্টানরা যে আমাদের জাতির অংশ নয় সেটা ঘোষণা করলেই তবে জাতীয় ঐক্য আসবে, কারণ তাঁর মতে অহিন্দুরা হিন্দু প্রথা, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে। এই ধারণা হেডগেওয়ারের শিষ্য মাধব সদাশিব গোলওয়ালকারের মাথাতেও প্রবিষ্ট করা হয়। এই যে অপরকে বাদ দেবার (এক্সক্লুশনারি) ধারণা তার ভালো বিবরণ পাওয়া যায় গোলওয়ালকারের লিখিত পুস্তিকা 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড' এ। পুস্তিকাটি তিনি ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করেন।

বইটি থেকে লেখক উদ্ধৃতি দিয়েছেন: জার্মান জাতি-গর্ব আজ সবার আলোচনার বিষয়। জাতি ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য জার্মানি তাদের দেশ থেকে সেমেটিক জাতির লোকেদের (ইহুদিদের) বের করে দিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে জাতি গর্ব তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় প্রকাশ পেয়েছে। জার্মানি আরো দেখিয়েছে যে জাতি ও সংস্কৃতির পার্থক্য যেহেতু শিকড় পর্যন্ত প্রসারিত, তাই মিশে যাওয়া প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার। আমাদের হিন্দুস্তানের পক্ষে এটি একটি ভালো ও লাভজনক শিক্ষা।

তিনি আরো বলছেন, বুদ্ধিমান জাতিগুলির অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় হিন্দুস্তানে বসবাসকারী অহিন্দু জাতিগুলির লোকেদের বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে সম্মান করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির মাহাত্ম্য ছাড়া কোন ধারণা পোষণ করা চলবে না। তাদের পৃথক অস্তিত্ব পরিহার করে হিন্দু জাতিগোষ্ঠীতে বিলীন হয়ে যেতে হবে। কিংবা তাদের এদেশে বাস করতে হবে হিন্দু জাতির পূর্ণ বশ্যতা মেনে নিয়ে। তাদের কোনো কিছু দাবি থাকা চলবে না— থাকা চলবে না কোন বিশেষাধিকার— এমনকি নাগরিক অধিকারও থাকবে না তাদের।

অনুরূপভাবে সাভারকার তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন, আমরা হিন্দুরা যদি শক্তিশালী হয়ে উঠি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের মুসলিম বন্ধুদের অবস্থা হবে জার্মানির ইহুদিদের মত।

১৯২৫ সালে আরএসএস এর গঠন। **১৯৫১** সালে গান্ধী হত্যায় সংঘের যোগ নিয়ে তাদের প্রতি জনগণের মনে যে ঘৃণার সঞ্চার হয় তার মোকাবিলায় সংঘ তার রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। এই জনসংঘের বর্তমান নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। জনসংঘের প্রধান নেতা তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি কাশ্মীরে জেলে থাকা অবস্থায় নিহত হন। এরপর

দিনদয়াল উপাধ্যায় জনসংঘের প্রেসিডেন্ট হন। তিনিও খুন হন। এরপর আসরে আসেন অটল বিহারি বাজপেয়ি। তিনি দুই দশক প্রেসিডেন্ট থাকেন। এই পর্বে জহরলাল নেহেরু ও তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ছিলেন। একপ্রকার তাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের স্বর্ণযুগ চলছিল।

১৯৭৫ সালে ইন্দিরার নেতৃত্বে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হলে জনসংঘ দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ কাজে লাগিয়ে সুবিধাবাদী জোট গড়ে তুলে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এভাবেই তাদের উদ্ভট আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার কারণে জনমানস থেকে হারিয়ে যাওয়া বাজপেয়ি-আদবানিরা নতুন করে ইন্দিরা গান্ধির আদেশে কারাবন্দি হবার সুবাদে জাতীয় তারকা হয়ে ওঠার সুযোগ পান।

ইন্দিরা জরুরী অবস্থা তুলে নিয়ে ১৯৭৭ সালে নির্বাচন ঘোষণা করে দেন। র (RAW) তাঁকে ভুল পথে চালিত করে। পরিণামে শ্রীমতি গান্ধি ও কংগ্রেস পার্টি নিদারুণভাবে পরাজিত হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ এর নেতৃত্বে ব্যাপক গণ আন্দোলনের ফল হিসেবে একটি মিলিজুলি সরকার তৈরি হয়। বাজপেয়ী ও আদবানি সেই সরকারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব পান। বিদেশ মন্ত্রক ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক।

জনতা সরকারের মেয়াদ ছিল স্বল্পকালীন। দু বছরের মধ্যেই সরকার ভেঙে যায়। নতুন নির্বাচন করে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। এসময় পুরনো জনসংঘ ভেঙ্গে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করা হয়।

ক্ষমতার গণ্ডিতে প্রবেশ করতে না পেরে ১৯৯০ দশকে সংঘ 'ধর্মাশ্রিত' চণ্ড জাতীয়তাবাদের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি বিষয় সামনে নিয়ে এলো। এক, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য সমাজবাদী সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও দুই, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তোলা। তারা ধারণা করলো এই দুটি কাজের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের যে কাজে তারা নেমেছে তার জন্য জনসমর্থনের ভিত্তি বাড়াতে তারা সক্ষম হবে। কারণ তারা ইতিমধ্যে দেখেছিল গরিব ও নিচু জাতের মানুষদের কাছে তাদের তথাকথিত হিন্দুত্বের ব্রাহ্মণ্য ধারণা বিশেষ সমর্থন পায় না। কর্মসূচি হিসেবে তারা রাম জন্মভূমি কর্মসূচি হাতে নেয়। রথযাত্রা সংঘটিত করা হয়। সে রথযাত্রার পথ ধরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হত্য, লুণ্ঠন, রক্ত ইত্যাদির সংক্রামিত প্রেক্ষায় ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উন্মত্ত জনতা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়। সারা দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর ভারততে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষমতাও জুটে যায়। ৯০ দশকের শেষে অটল বিহারী বাজপেয়ি প্রধানমন্ত্রী হন।

যাইহোক আগের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। প্রসঙ্গ সংঘ।

লেখক প্রশ্ন করেছেন সংঘ কি ফ্যাসিস্ট?

এই প্রসঙ্গে ফ্যাসিস্ট ধারণা সম্পর্কিত জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মার্স ট্রিসকে উদ্ধৃত করেছেন:

কোনো দল বা সংগঠন নিম্নলিখিত ধারণা গুচ্ছ মেনে চললে তাকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দেওয়া যায়....

এক, জাতির প্রাচীন গৌরবে ফিরে যাওয়ার তত্ত্ব প্রচার। যা হিটলার করেছিল।

দুই, স্তর বিভাজিত সামরিক ধরনের কর্পোরেট সামাজিক সংগঠন অর্থাৎ হিটলারের আদলে গেস্টাপো বা এস এস বাহিনী ও তার নানা স্তর।

তিন, নেতাকে প্রায় পুজো করা যা এখন ভারতের মিডিয়ার কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে করা হচ্ছে। কিন্তু নেপথ্য ক্ষমতা সংঘের।

চার, জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতার ডাক দেওয়া।
পাঁচ, পূর্ণ কর্মসংস্থানে ডাক দেওয়া হয়।
ছয়, আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদী বিদেশ নীতি।

লেখক জানাচ্ছেন সংঘ কিন্তু তার ভাবনা ও কার্যক্রমে এই সমস্ত ধারণাই মেনে চলছে, মেনে চলে।

এভাবে লেখক সংঘের নেচার, শাখা, সহযোগী সংগঠন, নীতি, কৌশল, প্রচার, অপপ্রচার, শিবসেনা-এবিভিপি-বিএমএস-ভারতের শিক্ষণ মন্ডল-বনবাসী কল্যাণ আশ্রম-ইতিহাস পুনঃ সংকলন সমিতি-সংস্কার ভারতী-বাস্তহারা সহায়তা সমিতি-পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ-বিদ্যাভারতী-সরস্বতী শিশু মন্দির-মাতৃছায়া-ভারতীয় কুষ্ঠ নিবারক সংঘ এই সংগঠনগুলি দেশের মধ্যে কীভাবে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে চলেছে তার বিশ্বাসযোগ্য ধারণা দিয়েছেন।

বিদেশে হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল-হিন্দু সেবিকা সমিতি-ন্যাশনাল হিন্দু স্টুডেন্ট ফোরাম-হিন্দু স্টুডেন্ট কাউন্সিল -ওভারসিজ ফ্রেন্ডস অফ বিজেপি-হিন্দু ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল মিশন ও ভারত বিকাশ পরিষদ সংগঠনগুলি বিদেশে কাজ করে চলেছে একই ভাবে।

সংঘ প্রধান উৎসব হিসেবে বর্ষ প্রতিপদ, হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস (শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের দিন), শ্রী গুরু পূর্ণিমা, রক্ষা বন্ধন বা রাখি, বিজয়া দশমী ও মকর সংক্রান্তি নিজস্ব ক্যালেন্ডারে প্রধান উৎসব দিবস এবং ছুটি হিসেবে ও নির্দিষ্ট দিবস হিসেবে উৎসর্গ করেছে।

প্রার্থনা সংগীত, একাত্মতা স্তোত্র, ভারত মাতার বন্দনা গান, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একটি কাল্পনিক জীবনধারা যা মূলত ঘৃণাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার সংক্রমণ করা! এর সাথে অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনের মিল পাওয়া যাচ্ছে না?

নারী-পুরুষের ভেদ, মেয়েদের প্রতি বিদ্বেষ-মানসিকতা, মেয়েরা আসলে নিকৃষ্ট এই ধারণা, বধূহত্যা, সতী প্রথা ইত্যাদিতে সংঘের রক্ষণকামী অবস্থান বারে বারে প্রকটিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হিংসায় সংঘের ভূমিকা। বিশ্বজোড়া মৌলবাদ ও তাদের 'সামাজিক আন্দোলনে'র সংগঠনগুলির পাশাপাশি সংঘের অবস্থান। কর্পোরেট ধনতন্ত্রের সাথে তার গাঁট-ছড়া সম্পর্ক। অতীতের 'স্বদেশি অর্থনীতি'র পরিত্যাগ এবং মার্কিন অর্থনীতিকে সাদরে গ্রহণ!

সংঘের মগজ ধোলাই এর তিন অব্যর্থ অস্ত্রঃ তথ্য বিকৃতি, অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জন।

এরই মধ্যে দিয়ে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংঘের রাজনীতি প্রথমবারের মতো ১৯৯৮ এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতের শাসন ক্ষমতায় নিজেকে এমন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে যাতে ভারতীয় জীবনধারায় অনুসৃত ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি (Unity In Diversity) ধারণাটি প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

গণতন্ত্রের আপাত ছদ্ম আবরণের আড়ালে সংঘ ধীর অথচ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তার রক্ষণকামী ধারণাগুলি ক্রমান্বয়ে ভারতীয় জীবন ধারার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে অবাধে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ১৯২৩ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়। তাদেরও নির্দিষ্ট একটি বিশ্ব বীক্ষা ছিল। তারা পারল না কেন? গুটিকয়েক রাজ্যের ক্ষমতায় কেবল তারা সীমাবদ্ধ থাকলো! জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মিলে যে রক্ষণকামী উদারতাবাদের ভাবধারা গঠন করতে তারা চেষ্টা করল তার লক্ষ্যটি ছিল ভারতীয় জাতীয়তা নির্মাণ। তা করতে কি তারা সক্ষম হলো? কেন হলো না? লেখক বলছেন ভারতের মুক্তমনা ও বামপন্থীরা ভারতে আচরিত 'ধর্ম' ও 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রতি বিরূপ থেকেছেন! র‍্যাশনাল পয়েন্ট অব ভিউ থেকে যারা ধর্ম

ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন যেমন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখকে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ধর্মাশ্রিত মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের জমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

সংঘের প্রবক্তারা তাদের প্রচার চালিয়ে গেছে। তারা বলতে সক্ষম হয়েছে প্রগতিশীলরা 'ধর্ম' বিরোধী, ভূয়ো ধর্মনিরপেক্ষ, সংখ্যালঘু ভাজনাকারী, ঐতিহ্যবাহী 'হিন্দু' মনোভাব থেকে বিচ্ছিন্ন ও সুবিধাভোগী এলিট। লক্ষ্যণীয় যে আচরিত জীবনের ক্ষেত্রে তথাকথিত উদার মনারা এই সমস্ত অভিযোগের পাল্টা কোনো জবাব দিতে পারেননি। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভিযোগগুলো তাদের সম্পর্কে সত্য। তারা মুখে জগত মেরেছেন। কিন্তু কার্যত সমাজের উপরিভাগের ঘি-এর সবটুকু চেটেপুটে খেয়েছেন!

ভোগ করেছেন এবং ব্যাপক জনতা তাদের জীবন যাপনের যে মানে নিক্ষিপ্ত ছিল সেখান থেকে তাদের তুলে আনবার কোন ভূমিকাই তারা আসলে নিতে চাননি। এইখানে এই যে ব্যাপক সাধারণের জীবনমানের অবনমনে থেকে যাওয়াটা অর্থাৎ হেরে যাওয়াটা এইটাকেই পুঁজি করে ধর্মাশ্রিত উন্মাদনার শক্তি তার ক্ষমতা প্রতিপত্তিকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে চলেছে। ইতিহাসবোধহীন, জ্ঞানবিহীন এবং জ্ঞান বিরোধী এমন এক অন্ধকারের সাম্রাজ্য কায়েম করবার লক্ষ্য তাদের, সে সম্পর্কে জনতাকে অন্ধকারে রেখে তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করবার এক বহুস্তর বিন্যস্ত সেন্টিমেন্টাল অর্গানাইজেশন তারা গঠন করে চলেছে। তথাকথিত উদারপন্থীরা যখন ক্ষমতায় থেকেছে তখন তারা কিন্তু সংঘ কর্তৃক ভারতীয় জীবনধারার মৌল প্রতিপাদ্য তথা দর্শনের বিভিন্ন তথ্য সংস্কার রূপে (ভোট ব্যাংকের হিসেব কষে) যখন ব্যবহার করেছে সেই ব্যাপারটিতে নীরব থেকেছে। এই নীরব থাকাটাও পরবর্তীকালে সংঘের জয়লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

লেখকের ভাষায় ভারতের মুক্তমনা ও বামপন্থীরা বিশেষ করে তাদের মধ্যে যে অংশটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উচ্চ শ্রেণি থেকে আসা তাদের পলিটিক্যাল এনলাইটেনমেন্ট সত্ত্বেও নৈতিকভাবে অধিপতিত ধনীদের থেকে নিজেদের ভাবমূর্তিকে আলাদা করার জন্য সচেতন প্রয়াস করেননি। রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলে বা ভীমরাও আম্বেদকর এর মত সামাজিক ধর্মীয় সংস্কারকদের প্রতি বামপন্থীদের অপছন্দ বা উদাসীনতার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের এজেন্ডা বোঝা আরো কঠিন হয়েছে। রিক্সাওয়ালা বা ভূমিহীন কৃষকের মত অদক্ষ শ্রমিকের কাছে বামপন্থীদের আন্তর্জাতিকতার স্লোগান খুব ধোঁয়া ধোঁয়া, পশ্চিমা চিন্তার ভারতীয় মার্কসবাদীরা 'ধর্মকে যেভাবে নিচু চোখে দেখেন' তাতে সাধারণ মানুষ আর এইসব শহুরে বাবুদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

অবশ্য স্বাধীন ভারতে নানা বামপন্থী গোষ্ঠী যেমন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সহমত, জননাট্য মঞ্চ, ঋত্বিক ঘটক ও আনন্দবর্ধনের মত প্রগতিশীল সিনেমা পরিচালক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, হাবিব তানভীর ও ইরফান হাবিবের মত কবি, লেখক, শিল্পী, পন্ডিত, শ্রমিক নেতা, নাম্বুদিরিপাদ ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতো বামপন্থী নেতা ও দলিত বুদ্ধিজীবী সমান সুযোগ, ন্যায়-নীতি ও সামাজিক প্রগতিশীলতার ধারণাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কিন্তু তাদের এই অক্লান্ত নিঃস্বার্থ কাজ উচ্চবর্ণের রক্ষণকামী হিন্দু এলিট, মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ, সংবাদ মাধ্যম এমনকি মূলধারার ভারতীয় বামপন্থীদের একটা অংশের কাছে পছন্দসই বা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে

যায়নি। বামপন্থীদের এক বিশাল অংশ তথাকথিত পার্টি শৃঙ্খলা-আনুগত্য ও ডগমা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

এইগুলিতে সংঘ সুযোগ পেয়েছে। তাদের ঘৃণা, আদিমতা ও কুসংস্কারকে জনসমক্ষে নতুন মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। তাদের এই নতুন মুখাবয়বে প্রকাশিত হচ্ছে জনগণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও যত্নশীল মনোভাব। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শহরের মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণ হিন্দু জনতা যারা প্রশাসন, নেতাদের দুর্নীতি ও চালচলন এবং বামপন্থী এলিটদের উদাসীনতায় বিরক্ত। এদের থেকে নিস্তার পেতে উদগ্র! এরাই সংঘ তথা বিজেপির প্রধান সমর্থক বৃত্ত!

অতএব কী করিতে হইবে?

লেখক বলছেন, সংঘকে তার নিজের খেলাতেই পরাস্ত করতে হবে। তাদের আধিপত্যবাদী ও বিভাজনকারী ধারণাকে হারাতে হবে ভারতীয় জীবন ধারার অসাম্প্রদায়িক এবং সবাইকে নিয়ে চলার ধারণা দিয়ে। যে জীবন ধারা শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায় ও ভক্ত কবিরের জীবনবোধ! এদের সাথে সঙ্ঘ পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক ‘ধর্মাশ্রিত’ মৌলবাদী গোষ্ঠীর ফারাক দেখিয়ে দিতে হবে। সঙ্ঘ পরিবারের বিভাজন সৃষ্টিকারী ও আধিপত্যবাদী ধারণার মুখোশ খুলে দিতে হবে। তবেই, একমাত্র তবেই গণ জনতা জানতে পারবে তাদের ধর্মান্ধতা ও প্রতারণা ঠিক কতটা? সেই জানা বোঝা, জানানো আর বোঝানোর মধ্যে দিয়েই তার মোকাবিলাও করা সম্ভব হবে।

সম্প্রতি রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ভারত জোড়ো কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। ইতিপূর্বে বামরা সংবিধান বাঁচাও এর ডাক দিয়েছিল। এই সমস্ত স্লোগান দিয়ে কতদূর এই আধিপত্যের শক্তিকে ঠেকানো সম্ভব? সেই প্রশ্নটি কিন্তু থেকে যাচ্ছে। কারণ আর্থসামাজিক কর্মসূচি ছাড়া এগুলি জনমানসে দাগ কাটে না। অর্থনীতির সাথে এর সংযোগ ঘটাতে হবে। লোকের সামনে বিকল্প হাজির করতে হবে! সেই বিকল্প কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য জানাশোনা বাড়াতে হবে । অর্থাৎ জ্ঞান। সেই জানা বোঝার প্রয়োজনে অবশ্যই পার্থ বন্দোপাধ্যায় এর বইটি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

সূত্র:

১। দানবের পেটে দুই দশক, পার্থ ব্যানার্জি; পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা মূল্য ২৫০ টাকা।

২। আরএসএস ও বিজেপি- শ্রমবিভাজন, এ জি নূরানী; নাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভিট লিমিটেড, কলকাতা;

৩। সভারকার ও হিন্দুত্ব, এ জি নূরানী; নাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভিট লিমিটেড, কলকাতা;

৪। উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড, এম এস গোলওয়ালকার

বামপন্থা নয়, বস্তুপন্থা?

শ্রীচেতনিক

জগৎ জুড়ে বামপন্থী বলতে বোঝায় ক্ষমতার উল্টো দিকে থাকা ক্ষমতার সমালোচক তথা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে। অন্যভাবে বললে ক্ষমতার ন্যায়-বিরুদ্ধ নীতি-বিরুদ্ধ দখলকামিতাকে মেনে না নিয়ে তার চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করতে পারার ক্ষমতা কে বামপন্থা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বামপন্থা ও তার অনুসরণকারীদের কার্যকলাপ হল মেয়াদী। অর্থাৎ রক্ষণকামী ক্ষমতা চক্রকে পরাজিত করা পর্যন্ত।

বামপন্থী বা বাম পন্থার পরিসমাপ্তি ঘটে যায় যদি সেই পক্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে। তখন আবার তার উলটো দিকে থাকা বিরোধী শক্তি তার নীতি-কাঠামোকে বস্তুগত সমালোচনায় বিদ্ধ করলে সে-ও বাম বলে বিবেচিত হবার দাবিদার হয়। কিন্তু এদেশে সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে দীর্ঘকাল জুড়ে ক্ষমতায় থাকলেও সিপিএম প্রভৃতি দল বামপন্থী বলে আখ্যায়িত হয়ে এসেছে। এতে করে গণমনে এবং এই দলগুলোর অভ্যন্তরে বাম ব্যাপারটি তাদের সর্বকালীন ও সামূহিক একটি পৈত্রিক সম্পত্তি এটি একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে! এই বিষয়টিতে পাড়ার দোকানদার সিপিএম ক্যাডার জনৈক রইসুদ্দিনও যা দলের বড়-মেজ-সেজ যেকোনো নেতাও তা, আবার ইতিহাসবিদ মিস্টার হাবিব বা থাপার অথবা সিনেমা পরিচালক তরুণ মজুমদারও তা।

তাই বামপন্থা ও বামপন্থী প্রসঙ্গে একটা 'ব্যাসিক' গোল বহুদিন হইতেই বাধিয়াছে বোধ হয়!

মহামতি লেনিন বলেছেন বামপন্থী কম্যুনিজম হল শিশুসুলভ বালখিল্যতা! অর্থাৎ কম্যুনিজম নামক আইডিওলজির সাথে এই বামপন্থা নামক ব্যাপারটি যায় না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তাঁকে শুনতে গেলে জানতে হয়। জানতে গেলে পড়তে হয়। পড়তে গেলে অধ্যবসায়ী হতে হয়! সেটি হতে গেলে সাততাড়াতাড়ি ক্ষমতার মুখরোচক বখরা পাবার নিশ্চয়তা কি থাকে? থাকে না। আর তাতে তখন তথাকথিত বামপন্থা বামপন্থা বলে চিল চিৎকার করবার দরকার পড়ে না! কম্যুনিজম তথা বস্তুগত ইডিওলজির সমকালীন প্র্যাগম্যাটিক প্রয়োগে বর্তমান রক্ষণকামী ক্ষমতাকে পরাজিত করার গাইড লাইনে পার্টি সজ্জিত করা হয়। শুরু হয় মুক্তির বস্তুপন্থাগত রণনীতি ও রণকৌশলী সংগ্রাম। যার লক্ষ্য অপক্ষমতার সমালোচনা কেবল নয়, সেই ক্ষমতা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আর্থসামাজিক ন্যায় তথা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

সেই বস্তুপন্থাগত গাইডলাইন নিয়ে কাজ করতে গেলে জীবনকে খন্ড খন্ড করে তা করা যায় না। অখণ্ড জীবন সূত্রে তা করতে হয়। অর্থাৎ তা শ্রম-মূল্য বিধৃত গোটা জীবনটাকে তার সামগ্রীকতাতেই ধরতে হয়। সেখানে তাই শ্রম ও মূল্যের হিসেব যেমন কষতে হয়, তেমনি সেই শ্রম-মূল্যগত জীবনের সারবত্তার শত্রু কে সেটাও চিনতে হয়। সেই শত্রু-মিত্র চিনতে জানতে আর শ্রম-মূল্যের হিসেব কষার কড়া-গন্ডার মধ্যেই নিহিত সেই বস্তুগত গাইড লাইনের চাবিকাঠি! সেখানে কে বামপন্থী কে নয় এই বালখিল্যতা চলে না!

শ্রম-মূল্যগত জীবনের সারবত্তা জানা বোঝা ও জানানো বোঝানোর মানবিক বার্তাবিনিময় আবহ তথা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিতে হয়। এই কর্মসূচিগুলির অনুশীলনে ব্যক্তিসত্তার রক্ষণকামিতা ও তার সাথে আর্থসামাজিক রক্ষণকামিতার যোগসাজসের দিকটি খুব

সহজেই উন্মোচন করা যায়। তখন আর নিজেকে বা অন্যকে এই বলে ধোকা দেওয়া যায়না যে এটা রাজনীতি এটা ক্ষমতার ব্যাপার, ওটা সংস্কৃতি ওটা গান বাজনা বা পালনের ব্যাপার, সেটা ধর্ম তা পালনের ব্যাপার! বরঞ্চ শ্রম-মূল্য নির্ভর জীবনের আইডিওলজি এইভাবে জীবনকে খণ্ডে খণ্ডে রক্ষণকামী বিভাজন করতে দেয় না। সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলি সেই লক্ষ্যেই প্রণয়ন করা হয়।

যাতে সংস্কৃতির পরোক্ষ রাজনীতি প্রত্যক্ষ রাজনীতির ধাত্রীর কাজ করে। রাজনীতি তখন অপরাজনীতিক পাশা খেলা থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় আর্থসামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।

এই হল একটি কথা। আর একটি কথা হল, সেই বামপন্থী ব্যাপার-স্যাপার দিয়ে কী হয়? তাদের ভাষায় সাংবিধানিক ব্যবস্থার আওতায় জনগণকে রিলিফ দেওয়া হয়! বেশ, এই রিলিফ মমতা দেবী দিলে তখন আপত্তি কী থাকে! কংগ্রেস বা ডিএমকে বা বিএসপি কিংবা এসপি দিলেও তা একই ব্যাপার নয় কি?

নাকি সেখানে দেওয়া মাল-মিটার (মিনিকিট বা টাকা বা প্রকল্প সহায়তা বা জমি বা ঋণ মকুব অর্থাৎ তা ক্যাশ বা কাইন্ড যাই হোকনা কেন!) এর স্বাদ-গন্ধ বিশেষ রূপে পৃথক কারণ কোথাও ডান বা কোথাও বাম গন্ধ তাতে মিশে থাকে! আহাম্মকি আর কারে কয়! তাই তো জনান্তিকে কেউ বলে, আস্তে কন কত্তা ঘোড়াই হাসব!

অতঃপর সমস্যার বর্তমান স্বরূপটি কী? আর তার মোকাবিলার পথ বা পন্থাটি কী?

বর্তমান স্বরূপ হল কর্পোরেটি নাশকতা আর তার পাহারাদার কেন্দ্র আর রাজ্যের অপরাজনীতিক দল-ক্ষমতা! কোথাও সে চরমভাবে শ্রম-শোষক কোথাও আবার ডোল দিয়ে তার পরিপূরকও!

সেই কর্পোরেটি মূল্য-বঞ্চনা ভিত্তিক অর্থনীতির ধারক রাজনীতিকে মোকাবিলা করবার পথটি অতঃপর কী হতে পারে? তার ভাষায় বা কী হবে?

নিশ্চয় সেই মোকাবিলার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সংগ্রামময়, কণ্টকাকীর্ণ! তার ভাষা-সন্দর্ভ রেডিমেড নয়! সেই ভাষা অতীত বর্জিত বর্তমান যন্ত্রণার ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই!

সেই ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তিক ভাষা সন্দর্ভকে তথাকথিত বাম বলে দেগে দেওয়া যায় না। তাকে ডানও বলা যায় না। বাম-ডানের এই বাইনারির বাইরে সমকাল জীবন সংকটের সমাধানবাচক রূপরেখা দেবার জীবনদর্শন বস্তুপন্থার জয় ঘোষনা করে দেয়। সেই বস্তুবাচক পথ জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামেরই পথ যা জ্ঞান-শ্রম-যৌনতা বাচক সৃষ্টিগত জীবনধারাকে বিকশিত করে। এবার প্রশ্ন উঠবে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম কী জিনিস? আর জ্ঞান-শ্রম-যৌনতার ধারাটিই বা কী? প্রশ্ন উঠুক। জীবন ও জগৎ তথা ব্যক্তি সত্তা ও সমাজ সত্তাবাচক Existence কে বস্তুগতভাবে জানাই হল জ্ঞান। সেই জ্ঞান যখন কার্যকর শক্তি হয়ে জীবন ও জগতের অর্থাৎ আর্থসমাজের অসুন্দরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে উদ্যত হয়, তখন তা বিশ্বাস অর্থাৎ সহন অর্থাৎ শক্তি। আর সেই ঝাঁটন প্রক্রিয়াটিই হল সংগ্রাম। যা জরাজীর্ণ আর্থসমাজ কাঠামোটি ভেঙে দিয়ে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। তাহলে আর কি বস্তুপন্থা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে? জ্ঞান -বিতর্ক শুরু হোক।

দেশপ্রেম

সুদীপ সরকার

আজ জব্বর মিঁঞা কাকভোরে নিজের চাষের জমিতে এসে শস্য পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইসমাইল, রহমত, সনাতন, বাদলেরা খানিক বাদে এসে দেখলো, আজকের জন্য জব্বর মিঁঞা তার চাষের কাজ অনেকটাই এগিয়ে ফেলেছে। অন্যদিন মিঁঞা এদের থেকে একটু পরেই মাঠে নামে কিন্তু আজকের কথা আলাদা। সনাতন জিগ্যেস করল, কি মিঁঞা আজ এত তাড়াতাড়ি মাঠে এসে পড়েছ যে! রহমত একটু ঠাট্টার সুরে বলল, কি চাচা, আজ চাচী কি একটু তাড়াতাড়িই তোমায় বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে! জব্বর মিঁঞা এদের সকলের থেকে শুধুমাত্র বয়সে অনেকটা বড় বলেই নয়, ওনার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব এদের সকলকেই মিঞার সাথে ঠাট্টা তামাশার পরিধি সম্পর্কে সদা সচেতন রাখে। মিঁঞা এদের সাথে বন্ধুর মত মিশলেও, এরা ওনাকে অভিভাবকের আসনে বসাতেই পছন্দ করে। ওদের উদ্দেশ্য করে মিঁঞা বলল, কালকের দিনটা কি তোদের মনে নেই! বাদল বলল, হ্যাঁ কাল ১৫ই আগস্ট, দেশের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু, আজকে তুমি এত সকালে মাঠে এসেছ বলে আমরা একটু অবাক হয়েছি! মিঁঞা বলল, অনুষ্ঠানের দিন আয়োজনের রমরমাটাই তোদের নজরে এলো, তার পেছনের প্রস্তুতি পর্বটা একবারের জন্যও তোদের মাথায় এল না। সনাতন মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ সেটাই, মিঁঞার আজ অনেক কাজ। সকলের বাড়ি গিয়ে তাদের কাছ থেকে সাধ্যমত চাঁদা আদায় করা থেকে শুরু করে মাইক্রোফোনের বন্দোবস্ত করা, উপস্থিত বাচ্চাদের জন্য টিফিনের আয়োজন করা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো, এছাড়াও আরো কত কিছু। ইসমাইল বলল, আমরা তো শুধু স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালে অনুষ্ঠান স্থলে গিয়ে হাজির হই। ঐ দিনটায় সকালের দিকে কিছুক্ষণের জন্য চাষের কাজ বন্ধ রাখি কিন্তু তার আগে অনুষ্ঠান আয়োজনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তো চাচা নিজের কাঁধেই তুলে নেয়। জব্বর মিঁঞা বলল, আমি যতদিন আছি ততদিন ওসব নিয়ে তোদের ভাবতে হবে না। শুধুমাত্র সকাল সকাল খেলার মাঠে চলে এলেই হবে। এবারে ভাবছি, সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু করে দেবো। সবাইকে সেই মত বলে রেখেছি। সেক্ষেত্রে নটা-সাড়ে নটার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। একটু বেলা হলে রোদের তেজ যেভাবে বাড়ছে, তাতে দেরী করে অনুষ্ঠান শুরু করলে বাচ্চাগুলোর খুব কষ্ট হবে। রহমত বলল, এবারে চাচা অনুষ্ঠানটা কীভাবে সাজাচ্ছ? মিঁঞা বলল, প্রথমে আমাদের মহল্লার সবথেকে প্রবীণ মানুষ সনাতনের দাদু, আমাদের সবার প্রিয় গোপাল খুড়ো জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে। এরপর সমবেত জাতীয় সঙ্গীত। লোকাল থানার ওসি সাহেব ও কিছু বিশিষ্ট মানুষের সাথে কথা হয়েছে, ওনারা আসবেন এবং আমাদের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সকলকে শোনাবেন। ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণণা করবেন। এরপর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য কিছু শিল্পীর সাথে কথা হয়েছে। তারা যথাসময়ে আসবেন বলে আমায় কথা দিয়েছেন। আমাদের মহল্লার কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়েও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করবে। সবশেষে প্রতিবারের মত একটা র‍্যালি বেরোবে যেটা বাজারের মোড় পর্যন্ত যাবে। বাদল বলল, চাচা কাল তাহলে আর মাঠে আসা হবে না! মিঁঞা বলল, কেন মাঠে আসা হবে না রে! সব

মিটে গেলে তারপর আমরা অবশ্যই মাঠে আসব। এখন ধান রোয়ার কাজ চলছে। মাঠে তো আসতেই হবে। একদিন আমরা একটু দেরীতে মাঠে আসব। শত সহস্র শহীদের বলিদানে পাওয়া দেশমাতৃকার স্বাধীন হওয়ার এই দিনটা তো আমাদের নিষ্ঠাভরে উদযাপন করতেই হবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বাদল, ইসমাইল, সনাতন, রহমত সকলে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে যে যার কাজে লেগে পড়ল।

এলাকায় জব্বর মিঁঞা বলে বহুল পরিচিত ব্যক্তিটির আসল নাম শেখ জব্বর আলি। মানুষজন সম্মান করে তাকে জব্বর মিঁঞা বলেই ডাকে। মিঁঞার দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ইংরেজ আমলে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। সেই কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমৃত্যু পেনশন পেয়ে এসেছেন। ছেলেবেলায় মিঁঞা তার দাদুর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক গল্প শুনেছে। ইংরেজরা জেলে বন্দীদের ওপর কি অকথ্য অত্যাচার চালাত, সেই কাহিনি শুনে বাচ্চা জব্বর শিউরে উঠত। দাদুর একটা কথা মিঁঞার শিশু মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, আমরা অনেক কষ্টে দেশকে স্বাধীন করলাম, এখন তোদের দায়িত্ব দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। মিঁঞার পড়াশুনা ক্লাস এইট পর্যন্ত । সংসারের আর্থিক প্রতিকূলতা পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছিল। অনেক অল্প বয়সেই হাতে কলমের বদলে লাঙ্গল কে জায়গা দিতে হয়েছে। তবু, যেনতেন প্রকারেণ নিজের দেশমাতৃকার জন্য কিছু করার তাগিদ মিঁঞার মধ্যে রয়ে গেছে। দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রবল বাসনা ছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় ডিগ্রীর অভাবে বাস্তবে সেই স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে। অল্প পৈত্রিক জমিকে সম্বল করে সর্বোচ্চ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে সংসারের অনটন বেশ খানিকটা দূর করেছেন। দুই ছেলে মেয়েকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছেন।

আব্বুর সাহচর্যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রেহান বিজ্ঞানে স্নাতক কোর্স সম্পূর্ণ করে সম্প্রতি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সে বর্তমানে কাশ্মীরের লাদাখ সীমান্তে পোস্টেড আছে। মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে চিরাচরিত গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান নি বরং তাকে উচ্চশিক্ষিতা করেছেন। তাই সুহানা আজ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা হয়েছে। পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে তবু মিঁঞার কাজের দৈনন্দিন রুটিনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনও প্রতিদিন সময়মত মাঠে যাওয়া, চাষের জমিতে বছরে তিনটে ফসল ফলানো যেনো মিঁঞার কাছে একটা নেশার মত। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু বাড়িতে অহেতুক শুয়ে বসে থাকার কথা এই কাজপাগল মানুষটা যেন ভাবতেই পারে না। অর্থাভাবে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ সেভাবে না মিললেও, জ্ঞান আহরণের ইচ্ছেটা এই আদ্যন্ত নিপাট ভদ্রলোকটার প্রথম থেকেই রয়ে গেছে। রেহান চাকরী পেয়ে তার আব্বুকে একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে দিয়েছে। সুহানা শিখিয়ে দিয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার। মিঁঞা এখন অবসর সময়ে ঐ অ্যান্ড্রয়েড সেটে ঘাড় গুঁজে কিসব যেন পড়েন।

রেহান প্রতিদিন রাতে ফোন করে তার আব্বু ও আম্মীর খোঁজ নেয়। সুহানা তো তার দাদার কাছে নয়নের মণি। মিঁঞার সংসারে এখন খুশীর হাট। এরজন্য মিঁঞা তার বিবি ফতেমার কাছে কিছুটা হলেও ঋণী। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিনগুলোতে নিদারুণ কষ্ট হাসি মুখে মেনে নিয়ে ফতেমা এই সংসারকে কিভাবে আগলে রেখেছিল তা মিঁঞার অজানা নয়। এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমা ঘরে আনলেই হয়। রেহানের কাউকে পছন্দ করা আছে কিনা সেটাও মিঁঞা দম্পতির কাছে অজ্ঞাত। দাদার মন বোঝার দায়িত্ব বর্তেছে সুহানার ওপর। এব্যাপারে সুহানা প্রতিদিন তার দাদাকে বিরক্ত করে। তাকে যে আব্বু-আম্মী এই

বিশেষ দায়িত্বটা দিয়েছে সেটাও সে রেহানকে মনে করিয়ে দেয়। দাদাও বলে দিয়েছে, তোকে আগে অন্য বাড়িতে না পাঠিয়ে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। তুই যা ঝগড়ুটে, আমার বিবির সাথে দিনরাত ঝগড়া করবি। তাই তোর নিকাহ না হলে আমি কিছুতেই অন্য বাড়ির একটা মেয়েকে এ বাড়িতে আনব না। ঝগড়ুটে ননদের জ্বালায় আমার বিবি দুদিনের মাথাতেই আমায় তালাক দিয়ে চলে যাবে। সেটা আমি হতে দিচ্ছি না। এসব কথা রেহান যত বলে সুহানা তত রেগে যায়। দাদা-বোনের খুনসুটি ফোনেও অব্যাহত থাকে।

আজ পনেরোই আগষ্ট। ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে মিঁঞা চলে এসেছেন অনুষ্ঠান স্থলে। স্বহস্তে আয়োজনের চিত্রপটে শেষ তুলির টানটুকু দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ধীরে ধীরে আবালবৃদ্ধবনিতা ভিড় জমাতে শুরু করেছে। মাননীয় ওসি সাহেবও এসে পড়েছেন। ওসি সাহেব ব্যক্তিগতভাবে মিঁঞাকে খুব পছন্দ করেন। মিঁঞার নি:স্বার্থ জনহিতকর কাজগুলো ওসি সাহেবের খুব ভালো লাগে। মহল্লার ছেলে ছোকরাদের নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা বা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বা বন্যার সময় ত্রাণশিবির, সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের পুরোভাগে থাকেন সমাজসেবক মিঁঞা। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও মিঁঞাকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। আদ্যন্ত অরাজনৈতিক এই মানুষটি শত প্রলোভনেও নিজের জামায় রাজনীতির কোনো রঙ লাগতে দেননি। ফলত, সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে রয়ে যেতে পেরেছেন। ওসি সাহেব দুবছর হল এই থানায় এসেছেন, কিন্তু একবারের জন্যও ওনাকে এই মহল্লায় কোনো গন্ডগোলের মীমাংসা করার জন্য অফিসিয়াল দায়িত্ব নিয়ে আসতে হয়নি। বরং, প্রতিবারই এসেছেন অতিথি হয়ে, সেটা হয় রক্তদান শিবিরের প্রধান অতিথি হয়ে বা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে অথবা দূর্গাপুজো মন্ডপের ফিতে কাটতে বা ঈদের আগে কোনো ইফতার পার্টির দাওয়াত রক্ষা করতে। ব্যতিক্রমী এই মহল্লায় বিরাজমান অপার শান্তির নেপথ্যে রয়েছে মিঁঞার মত কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উন্মুক্ত মানসিকতা। এই মহল্লায় ঈদ যতটা সাড়ম্বরে পালিত হয় ঠিক ততটাই সোৎসাহে উদযাপিত হয় দূর্গাপুজো। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান যথারীতি চলছে। প্রবীণ গোপাল বাবুর হাত দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ওসি সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন। নিজের বক্তব্য শেষ করার আগে ওসি সাহেব একটা অনুরোধ করে বসলেন, আজ আমি শেখ জব্বর আলিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। আপাদমস্তক সংগঠক মিঁঞা নিজেকে লাইম লাইটের আড়ালে রাখতেই বরাবর স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তাই সচরাচর উনি মাইক্রোফোন হাতে ধরেন না। নিঃশব্দ কর্মীর রূপটাই ওনার বিশেষ পছন্দের। যাইহোক, ঘটনার আকস্মিকতার প্রাথমিক অপ্রতিভতা কাটিয়ে মিঁঞা মাননীয় ওসি সাহেবের সম্মান রক্ষার্থে হাতে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন। মিঁঞা বলতে শুরু করলেন, আমাদের বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করার পাশাপাশি তাদের আদর্শ জীবনচর্চার লেশমাত্র যদি আমরা আত্মীকরণ করে নিজ নিজ কাজে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারি তবেই এই স্মৃতিচারণা সার্থকতা লাভ করবে। জাতির জনকের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা আমি দেখাব না কিন্তু তার সুবিশাল মানবিক কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণা এখানে উপস্থিত সকলকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস। উনি ভারতে আসার পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ শহরে ওকালতির ব্যবসা করতেন। সেই সময় ওখানকার কুলি লোকেশনে মারাত্মক ছোঁয়াচে কালা প্লেগের সংক্রমণ দেখা যায়। এই কুলি লোকেশনে ভারত থেকে আগত মানুষজনের সংখ্যাই ছিল বেশি। ওদেশের বেশিরভাগ মানুষজন এদের অস্পৃশ্য মনে করত। স্বভাবতই এই মানুষগুলো যখন ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করল তখন তাদের চিকিৎসা

বা সেবা শুশ্রুষা করার জন্য কোনো সহৃদয় ব্যক্তির দেখা মিলল না। সেইসময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নিজের মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে, তার ওকালতি ব্যবসার পসার বিসর্জন দিয়ে মানবিকতার খাতিরে এগিয়ে এলেন এই সহায় সম্বলহীন অসুস্থ মানুষগুলোকে সেবা করতে। শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে তিনি বহু মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন অত সংখ্যক ছোঁয়াচে রোগীর সাথে একসঙ্গে কাটালেও মহাত্মাকে কিন্তু ঐ মারণব্যাধি স্পর্শও করতে পারেনি। নেতাজির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ওনার সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞের চুলচেরা বিশ্লেষণ আমার বোধের অতীত কিন্তু ওনার মহৎ হৃদয়বত্তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমার মনে হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক থাকাকালীন উনি একবার কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হন। যথাযথ চিকিৎসায় উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু ওনার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে যায়। তখন জনৈক ডাক্তারবাবু ওনাকে প্রতিদিন একটা করে সেদ্ধ ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেন কিন্তু উনি বিনীতভাবে ডাক্তারবাবুকে জানান "যেদিন আমার বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের মুখে প্রতিদিন একটা করে সেদ্ধ ডিম আমি তুলে দিতে পারব সেদিন আমিও একটা সেদ্ধ ডিম খেতে পারব, তার আগে নয়। এই ঘটনাই প্রমাণ করে বড় নেতা হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বড় হৃদয়ের মানুষ হওয়া। এই সকল মহাপুরুষদের অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত জীবনচর্চার অনুশীলন আমরা নিজেদের জীবনেও করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি কেউ যদি তার নিজের কাজটা সততার সাথে নিষ্ঠাভরে করতে পারে তবে সে প্রকৃতই দেশসেবা করছে। সমষ্টির অবদানেই দেশ এগিয়ে যেতে পারে। মিঁঞার মূল্যবান অথচ নাতিদীর্ঘ বক্তব্য শুনে উপস্থিত অনেকের মত ওসি সাহেবও বিস্মিত হন। মিঁঞার পড়াশুনার গভীরতা তৎসহ বিষয় নির্বাচনে বিচক্ষণতায় ওসি সাহেব যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর ওসি সাহেব নিজে এগিয়ে এসে মিঁঞার সাথে করমর্দন করে বললেন, আমার কুড়ি বছর চাকরি হয়ে গেল, এত আবেগমথিত বক্তব্য রাখতে আমি এর আগে কাউকে দেখিনি।

মিঁঞার আজ দুপুরে বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেল। অনুষ্ঠান শেষে বাদল, রহমতদের সাথে চাষের খেতে গিয়েছিলেন। সেখানে মধ্য গগনে থাকা রবি কিরণকে উপেক্ষা করে চাষের প্রাসঙ্গিক কিছু কাজ সেরেছেন। ফতেমা বিবি আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মাছের কিছু পদ রেধেছেন। রান্না করা এই পদগুলো রেহানেরও সবিশেষ পছন্দের। তাই ভোজনের প্রাক্কালে সকলের স্মৃতিতেই রেহানের প্রসঙ্গ চলে এল। মধ্যাহ্নভোজের পর বিছানায় শুয়ে টিভিতে নিউজের চ্যানেলগুলো ঘোরানো মিঁঞার দীর্ঘদিনের অভ্যেস। খবরের চ্যানেলগুলো দেখতে দেখতে একটা খবরে মিঁঞার চোখ দুটো আটকে গেলো, আজ ভোর রাতে লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় সেনা ঘাঁটিতে জঙ্গিরা অতর্কিতে হামলা চালায়। পনেরো জন সৈনিক ঘটনা স্থলেই প্রাণ হারান। অন্তত তিরিশ জন সেনা গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত্তি আছেন। জনৈক জঙ্গি সংগঠন ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। মিঁঞার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, কান রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। গভীর দুশ্চিন্তায় নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছেন না। ফতেমা বা সুহানাকে কিছুতেই এখন এ খবর দেওয়া যাবে না। ওরা তাহলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। নিজের মধ্যে এই অসহনীয় যন্ত্রণা বয়ে বেড়ানোও তো দু:সাধ্য। বাইরে বেরিয়ে পাঁচজনের সাথে কথা বললে হয়ত একটু হাল্কা হওয়া যায় কিন্তু এই অসময়ে বাইরে বেরোলেই তো ফতেমা বা সুহানা সন্দেহ করবে। ওদেরকে এখনই কিছু জানানো উচিত হবে না। ওরা পাছে কিছু বুঝে যায় তাই মিঁঞা টিভির সুইচটা অফ করে দিয়ে নিজের মনে দুশ্চিন্তার

চোরাস্রোত বহন করতে লাগলেন। চাপটা নিতে না পেরে, কিছুক্ষণ বাদে মিঁঞা ওসি সাহেবকে ফোন করলেন। ওসি সাহেবও আশাব্যঞ্জক কিছু শোনাতে পারলেন না। খোদ প্রতিরক্ষা দপ্তরের খবর স্বরাষ্ট্র দফতরের একদম নিচু তলায় পৌঁছাতে খানিক সময় তো লাগবেই। মফঃস্বল এলাকায় বিশেষতঃ ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সহ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের রমরমার যুগে, এই ধরণের একটা খবর যে পরিবারের থেকে বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখা যাবে না তাও মিঁঞা বিলক্ষণ জানেন। হলও তাই। প্রতিবেশি মারফত সংবাদটা ফতেমা ও সুহানা দুজনেরই কর্ণগোচর হল। দিশেহারা মা ও বোনের উৎকণ্ঠিত সকল প্রশ্নের জবাব মিঁঞার কাছেও নেই। প্রতিবেশিরা বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। মিঁঞা বাইরে রুক্ষতা বজায় রাখলেও ভেতরে গভীর শূন্যতা অনুভব করছেন। এক অজানা আশঙ্কায় বারংবার তার বুকটা কেঁপে উঠছে। সন্ধ্যা নাগাদ মিঁঞার ফোনটা বেজে উঠল। "ওসি সাহেব কলিং"। ফোনটা রিসিভ করতে ডাকাবুকো মিঁঞারও হাতটা কাঁপছে। উদ্বেগ মিশ্রিত গলায় বললেন, হ্যালো। ওপ্রান্ত থেকে ওসি সাহেব চাপা স্বরে বললেন, এক্সট্রিমলি স্যাড নিউজ, লাদাখে পনেরো জন বীর শহিদের একজন হল আমাদের রেহান আলি। মিঁঞার অশ্রুসজল নিষ্পলক স্থির চিত্ত উপস্থিত সকলকে ঘটনাক্রমের দুর্ভাগ্যজনক চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত করাল। পুত্রহারা মায়ের শোকাতুর আর্তনাদে প্রকৃতিও যেনো বিয়োগ যন্ত্রণার ভয়াবহতা টের পাচ্ছে। সুহানাকেও সামলানো যাচ্ছে না। মহল্লার প্রতিটা বাড়ি আজ যেনো জনমানবশূন্য। কারোও বাড়িতে উনুন জ্বলছে না। তারা সকলে মিঁঞার বাড়িতে ভিড় করেছে, এই দুঃসময়ে এক বীর শহীদের পরিবারকে স্বান্তনা দেওয়ার জন্য। যে শহীদের জন্য গোটা মহল্লা গর্বিত। ওসি সাহেব মিঁঞাকে ফোন করে জানালেন আগামীকাল বিকাল চারটে নাগাদ বীর শহীদ রেহান আলির কফিন বন্দী দেহ এলাকায় আসবে।

বীর সৈনিকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পূর্বে অতিবাহিত প্রতিটা সেকেন্ড মহল্লার মানুষজন নিষ্পলক নয়নে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ব্যয়িত করলো। আপামর এলাকাবাসী ব্যথিত চিত্তে অশ্রুসজল নয়নে ঘরের ছেলেকে চির বিদায় জানালো। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় বীর শহীদ রেহান আলির শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

এতজন বীর সৈনিকের অপ্রত্যাশিত শহীদ হওয়ার ঘটনায় গোটা দেশ শোকস্তব্ধ। দেশের অন্যান্য জায়গার মত এই মহল্লাতেও ইতি উতি স্মরণসভা বা মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে বীর সেনানীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর্ব চলছে। রেহানের জন্যই বোধহয় এই মহল্লায় আয়োজনের ঘনঘটাটা একটু বেশিই। বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের নেতা মিঁঞার সাথে দেখা করে সহানুভূতি দেখিয়ে গেছেন। কেউ কেউ আবার মিঁঞাকে রাজনীতিতে যোগদানের প্রস্তাবও দিয়েছেন। একে মিঁঞার পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি তার সাথে যুক্ত হয়েছে বীর শহীদের পিতা হওয়ার মত অতিরিক্ত তকমা। উনি যে দলে যোগদান করবেন সেই দলেরই লাভের পাল্লা ভারী হবে। সবাই যে যার মত করে ওনাকে প্রস্তাব দিচ্ছেন। মিঁঞা শুধু শুনে চলেছেন। কাউকে উত্তর দেওয়ার মত অবস্থায় উনি নেই। এক পুত্রহারা পিতা ভগ্ন হৃদয়ে শোকাচ্ছন্ন পরিবারের সদস্যদের সামলাতেই ব্যস্ত। রহমত, সনাতন, বাদল, ইসমাইলরা নিয়মিত মিঁঞার সাথে দেখা করতে আসে। বাদল একদিন বলল, চাচা আর নেওয়া যাচ্ছে না। রেহানদের স্মরণে সেদিন মহল্লায় মোমবাতি মিছিল হল, মিছিলের সামনের সারিতে ছিল পাশের মহল্লার সেই অসৎ রেশন ডিলার রমেন সামন্ত, যে গতবছর গরীব মানুষের রেশনের প্রাপ্য চাল ব্ল্যাক মার্কেটিং করার জন্য জনরোষের শিকার হয়েছিল। মিছিলে এমন হাবভাব করছিল যেনো ওর থেকে বড় দেশপ্রেমিক আর কেউ হয় না। ইসমাইল বলল, সেদিন স্কুল মাঠে একটা

স্মরণসভায় দেখলাম বহিরাগত কুখ্যাত ফিরোজ আলি দেশপ্রেম নিয়ে বড় বড় কথা বলছে। সেই কুখ্যাত স্মাগলার ফিরোজ আলি যে নিজে একজন রেপ কেসের আসামী আর যার নামে এখনও বেশ কয়েকটা খুনের কেস আদালতে বিচারাধীন। রহমত বলল, সেদিন সমীর মাইতি যে গতবছর নিজের মা কে খেতে না দিয়ে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়েছিল, আমরা সবাই উদ্যোগ নিয়ে মা জননীকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালাম, সেই সমীর মাইতি পাড়ার চায়ের দোকানে দেশাত্মবোধের বড় বড় ভাষণ দিচ্ছিল। সনাতন বলল, সমাজের অপাংক্তেয় মানুষগুলো আজ যেনো নিজেদের দেশপ্রেমী বলে জাহির করতে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন যে যত জোর গলায় দেশাত্মবোধের কথা বলতে পারবে সে তত বড় দেশপ্রেমিক। সবাইকে হতোদ্যম দেখেও মিঁঞা নিশ্চুপ রইলেন। বাহ্যিক আপাতত কাঠিন্য বজায় রাখলেও দৃঢ়চেতা মানুষটা মনের অন্তঃস্থলে পুত্রশোকের দগদগে গভীর ক্ষতটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। নিজেও উপলব্ধি করছেন, এভাবে চলতে পারে না। আমাকে পুনরায় স্বমহিমায় ফিরে আসতেই হবে, কিছু একটা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করতেই হবে নচেৎ আর যাই হোক রেহানের আম্মি আর বোন কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারবে না। সন্ধ্যাবেলা মিঁঞা সুহানাকে ডেকে বললেন, মা দেখ, তোর ভাইজান আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না, কিন্তু আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে তোর ভাইজানের স্মৃতিকে কি অমর করে রাখতে পারি না! তাতে কি তোর ভাইজান বেশি খুশি হবে না! সুহানা তার আব্বুর গায়ে আশ্বস্ততার হাত রাখল, যেনো সেও এমনই কিছু একটা ভাবছিল। পরদিন সকালে বাড়ির দরজায় হঠাৎ ওসি সাহেব এসে হাজির, বীর শহীদ রেহান আলির সরকারী স্মরণসভা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে। রেহানের সেনা ইউনিফর্ম পরিহিত একটা ছবিও ওসি সাহেব সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

ভগ্নহৃদয় এক পিতা নিজের অবাধ্য চক্ষুযুগল সংযত রেখে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন পুত্রের স্মরণসভায়। বাদল, ইসমাইলরাও সঙ্গে এসেছেন। ওসি সাহেব ইশারায় মিঁঞাকে মঞ্চে ডেকে নিলেন। মিঁঞা মঞ্চে রাখা হাস্যময় রেহানের ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। ছবিটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। মঞ্চ থেকে চেয়ারে উপবিষ্ট এলাকার গণ্যমান্য মানুষজনকে দেখা যাচ্ছে। আজ ওসি সাহেব বলার সুযোগ দিলে মনের কিছু কথা সকলকে জানানো যায়। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও বিধায়ক সাহেব। সবার শেষে প্রত্যাশা মাফিক মিঁঞার বলার সুযোগ এলো। মিঁঞা শুরু করলেন, এতো বড় মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। আমি অতি সাধারণ একজন কৃষক। শহীদ রেহান আলির বাবা বলেই হয়ত এই সুযোগ মিলেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় মনে করি, যে মানুষ তার নিজের কাজটা সততার সাথে নিষ্ঠাভরে করে তার থেকে বড় দেশপ্রমিক আর কেউ হয় না। সকলের সম্মিলিত অবদানেই আমাদের দেশ সমৃদ্ধশালী হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশাত্মবোধের বহিঃপ্রকাশ খুবই ভালো কিন্তু তার আগে নিজের মনের আয়নায় দেখা উচিত আমার ওপর ন্যস্ত নূন্যতম সামাজিক দায়িত্বগুলো আমি ঠিকঠাক পালন করছি কিনা। রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় প্রবেশ করে দেশসেবা করার মত যোগ্যতা আমার নেই। আমি অরাজনৈতিক ভাবে সমাজের জন্য কিছু করতে চাই যা প্রকৃতপক্ষে দেশসেবারই নামান্তর বলে আমার বিশ্বাস। চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ রেহানের দপ্তর থেকে যা অর্থ পাওয়া যাবে তার সবটা দিয়ে আমি রেহানের নামাঙ্কিত একটা ফাউন্ডেশন গঠন করতে চাই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটা ট্রাস্ট এই ফাউন্ডেশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। এই সংস্থা আর্থিক প্রতিকূলতায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রী সহ

সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের হিতার্থে কাজ করবে। উপস্থিত গুণীজনদের কাছে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আপনাদের সকলকে আহবান জানাচ্ছি, এই কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য।

সাম্প্রতিক কালে ঘটা কতিপয় অকিঞ্চিৎকর মানুষের প্রগলভতার সাপেক্ষে এক বীর শহীদের পিতার বলা সংক্ষিপ্ত, ব্যতিক্রমী কিন্তু প্রাসঙ্গিক কিছু কথা অনুষ্ঠান স্থলের আবহে যেনো অন্য মাত্রা যোগ করল। সমগ্র অনুষ্ঠানস্থল করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে মিঁঞাকে অভিবাদন জানালেন। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরাও মিঁঞার শুভচিন্তাকে সাধুবাদ জানালেন। সনাতন, রহমত, বাদল, ইসমাইলদের মুখগুলো আনন্দে উদ্ভাসিত। তাদের পরিচিত মিঁঞা আবার স্বমহিমায়। সুহানার মুখে অনেকদিন বাদে এক চিলতে হাসি। বক্তৃতা শেষ করে রেহানের ছবির দিকে মিঁঞা একবার তাকালেন। রেহানও যেন ঘাড় নেড়ে তার আব্বুর উদ্যোগকে স্বাগত জানালো।

বিজ্ঞাপন

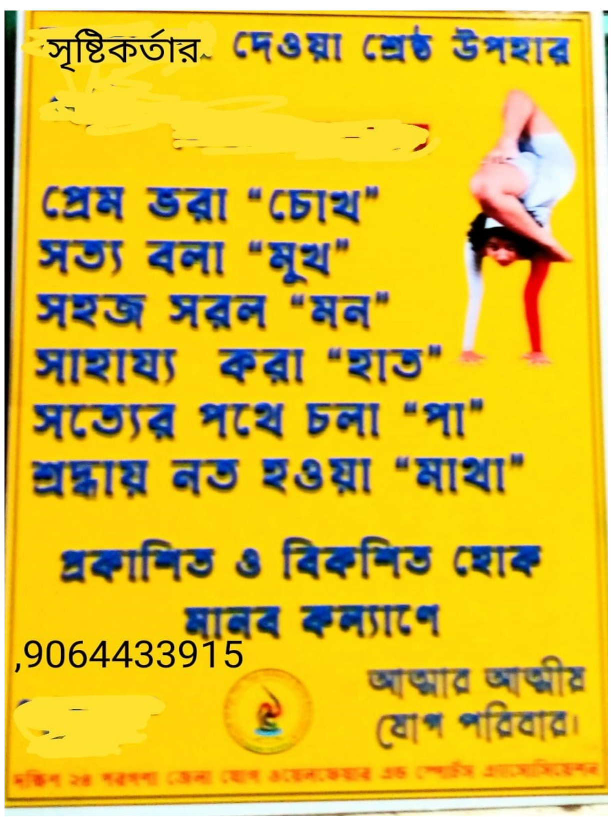

হুশ

সুবীর সেন

অফিস সময়ের ব্যস্ত মোড় পেরিয়ে কালেক্টরেট অফিসের গলি ছাড়িয়ে একটু দূরে চায়ের দোকানটি! ভোলাদার টি-স্টল! ঝিক ঝাক দোকান। অফিস গোয়ারদের ব্যস্ত বেলা! দোকানে ভোলা সমেত লোকাল জনা পাঁচেক লোক।

কী নিয়ে যেন বিসম্বাদ চলছে!

নরহরি প্রতিদিনের মত নিশব্দে দোকানে ঢুকল। ভোলা তার হাতে ধরিয়ে দিল গরম লাল চা এর পেয়ালা। ওদিকে তরজা চলছে!

—ওসব কথায় আর চিড়ে ভিজবে না। অনেক হয়েছে। তোমাদের ভাই গোটা একটা দেশ দিয়েছি, যাওনা সেখানে, এখানে এত ট্যাফো করছ কেন?

—আরে যত নষ্টের গোড়া, তো ওই গান্ধীটা। সেকুলার মারাবে! এই করেই তো বাঁশটা নিল! --- গ্রামের দিকে গেলে দেখবে কি বড় বড় অট্টালিকা, শালা এত টাকা পায় কোথায়?

—আরে দাঁড়াও না আর কিছুটা দিন যেতে দাও! হিন্দু বলে আর কিছু থাকবে না, গোটাটাই জেহাদি ভর্তি হয়ে যাচ্ছে!

—এখানে কিছু একটা হলে অমনি বাংলাদেশে কচুকাটা করে দিচ্ছে! আমরা বসে বসে ভেরান্ডা ভাজছি। —কাশ্মীরে বেছে বেছে মারছে। আমাদের বসে থাকলে হবে না। এতদিন বহু দেখলাম, সেকুলার মারিয়ে কোনো লাভ নেই। এবার পাল্টা মার দিতে হবে! নরহরির চা শেষ। চা খাওয়া শেষ হলে সে আর বসেনা। ওদিকে একবগগা আলোচনার মাঝে হঠাৎ বিষ্ণুবাবুর আগমন। তিনিও নিরবে নরহরীর মত কিছুক্ষণ ওদের কথা শুনলেন। তারপরে ভোলার উদ্দেশ্যে বললেন, কীরে তোর ছেলেটা এবার কোন ক্লাসে পড়ছে? ভোলা উত্তর দিল জয়েন্টের প্রিপারেশন করছে। ছেলেটিকে ডাক্তার করার খুব ইচ্ছে। কিন্তু বিশুদা পারবো কি, যা খরচা!

—এখনতো দম বেরিয়ে যাবে। তবুও হাল ছাড়িস না। ছেলেটির মেরিট আছে।

—আচ্ছা এবার বল হিন্দু রাষ্ট্র দিলে কি তুই তোর ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবার নিশ্চয়তা পাবি? ভোলা হঠাৎ এরকম প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! সে কোন কথা বলতে পারল না।

এতক্ষণের আলোচনার বীর পঙ্গুবরাও রিটায়ার্ড টিচার বিষ্ণুর প্রশ্নে কী বলবে ভেবে পেল না!

—ধর্ম রাষ্ট্র নিতে চাস? পাকিস্তানকে দেখ! কী দেখতে পাস? বেহাল অর্থনীতি! নানান ধরনের উগ্র সহিংস সশস্ত্র কান্ডকারখানা! ব্যাপক দারিদ্র! খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে! ধর্ম আফিম বিষ-জর্জর!

কথাটা শেষ করে বিশু দাঁড়ালেন না। বাকিরা ও আর বিশেষ জুত করতে পারল না। কেমন যেন পাশুটে হয়ে গেল পরিবেশটা!

আর আই (RI) জীবনলাল নিজের ছেলের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। মাস্টার্স বিএড করে ছেলেটি বাড়িতে বসে! বাকিদের মুখ দেখে তাদের ভাবনা আর ঠাহর করা গেলনা।

নরহরি দোকান থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে হাটা দিল!

পুনঃপাঠ

সাহিত্যের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য

মুন্সী প্রেমচাঁদ

[10 এপ্রিল 1936 সালে লখনউতে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত মুন্সি প্রেমচাঁদের সভাপতির ভাষণ। এ ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন হিন্দুস্তানি ভাষায়। (লেখাটি ইন্টারনেট ইংরেজি সংস্করণ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ আযাদ হোসেন)]

সাহিত্যের ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি স্মরণীয় ঘটনা। এতদিন আমরা ভাষার সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সন্তুষ্ট ছিলাম। বর্তমান সমালোচনামূলক সাহিত্য (উর্দু ও হিন্দি) শুধুমাত্র ভাষার গঠন ও কাঠামো নিয়েই কাজ করছে। কাজটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সাহিত্যের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বরা প্রশংসনীয়ভাবে এই প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ভাষা হল মাধ্যম, লক্ষ্য নয়; ভাষা হল সোপান, গন্তব্য নয়। ভাষার উদ্দেশ্য আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আবেগ পরিশিলীত করা ও সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া। আমাদের বিষয়ের সারবস্তু (অর্থ) সন্ধান করতে হবে ও ভাষা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। এটিই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

সাহিত্য জীবন-বাস্তব অর্থাৎ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবন-প্রতিবেশের বস্তুবাচক অভিব্যক্তি। সাহিত্য সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। তা আমাদের বুদ্ধি এবং অনুভূতিতে আঁচড় কাটে। জীবনের বস্তুত্ব অর্থাৎ বস্তুমুখীন জীবন সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হলে সাহিত্যের এই গুণাবলী থাকে। রূপকথার গল্প ও রাজকীয় প্রেম কাহিনি পুরানো দিনে আমাদের মুগ্ধ করলেও তা আজ মূল্যহীন। সাহিত্যে জীবন-বাস্তবতা প্রতিফলিত না হলে তার কোনো আবেদন নেই। সাহিত্য হল জীবনের সমালোচনা। অদূর-অতীতে আমাদের সাহিত্যের জীবন-বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমাদের লেখকরা স্বপ্নের জগতে বাস করতেন এবং ফাসনাই আজাইব বা চন্দ্রকান্তার মতো বিষয় নিয়ে তারা লিখতেন। কাহিনিগুলি ছিল নিছক বিনোদন বা অতিন্দ্রীয়তা বাচক। জীবন ও সাহিত্য ছিল পরস্পর সম্পর্ক বিহীন দুটি ভিন্ন বিষয়।

সাহিত্যে সমকাল প্রতিফলিত হয়। অতীত অবক্ষয়কালে সাহিত্যের প্রধান কাজ ছিল আর্থসমাজের পরগাছা শ্রেণির মনোরঞ্জন করা। তখন সাহিত্যে যৌনতা, রহস্যবাদ, হতাশাবাদ বা নিয়তিবাদ প্রাধান্য করত। এর মধ্যে প্রাণশক্তি, মৌলিকতা বা মনোযোগ কিছুই থাকত না।

কিন্তু আমাদের সাহিত্য-রুচি দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে। জীবন-বাস্তবতার সাথে তা ক্রমশ ওতপ্রোত হচ্ছে। আর্থসামাজিক একক হিসাবে আর্থসমাজ বা মানুষের সাথে যুক্ত হচ্ছে। বিরহের গান বা অতিন্দ্রীয় গালগল্পে এখন সে তৃপ্ত হয় না। জীবনের সমস্যাগুলির সাথে সে নিজেকে যুক্ত করে। সাহিত্যের এই বিষয়বস্তু মূল্যবান। যে সাহিত্য আমাদের মধ্যে সমালোচনামূলক চেতনা জাগায় না বা আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক চাহিদা পূরণ করে না, যা শক্তিপ্রদ এবং গতিশীল নয়, যা সুন্দরের চেতনা

জাগায় না, যা আমাদের চ্যালেঞ্জিং বাস্তবতার মুখোমুখি হতে দেয় না, তাতে আমাদের কোনো কাজ নেই। তা সাহিত্য পদবাচ্য নয়।

অতীতে ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গাইডের দায়িত্ব নিত। এই কাজে তার প্রধান হাতিয়ার ছিল ভয়, ছলনা, পুরস্কার ও প্রতিশোধ। আজ সাহিত্য একটি নতুন কাজ হাতে নিয়েছে। এর সহায় হল আমাদের অন্তরের সৌন্দর্য। সাহিত্য আমাদের মধ্যে সুন্দরকে জাগিয়ে তোলে। লেখক এই সুন্দরের অনুভূতিকে যত বেশি বিকশিত করবেন, তার লেখা তত বেশি কার্যকর হবে। যা কিছু কুৎসিত, ঘৃণ্য বা অমানবিক সবই এই লেখকের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন তার আদর্শ মানবতা, নৈতিক দৃঢ়তা ও উচ্চ চেতনা। তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় লাঞ্ছিত, নিপীড়িত এবং শোষিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সাহায্য করা। তার বিচারক আর্থসমাজ নিজেই। আর্থসমাজের সামনেই সে তার ফরিয়াদ বয়ান করে। সে জানে তার গল্প যত বেশি বস্তুমুখীন, তার ছবির অভিব্যক্তি যত বেশি যথাযথ, মানব প্রকৃতি ও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ যত বেশি প্রগাঢ় সমাজমন তত বেশি তার প্রভাব বৃত্তে এসে যায়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো শুধু মানবিকই নয়, তাদের হতে হবে হাড়-মাংসের জীবন্ত মানুষ। কাল্পনিক মানুষ নিয়ে আমাদের কাজ নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সুন্দর কী? জলপ্রপাত, সূর্যাস্ত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঘটনা কেন আমাদের প্রভাবিত করে? কারণ, তাদের মধ্যে রঙ বা শব্দের একটি নির্দিষ্ট ঐকতান রয়েছে। আমরা নিজেরাও ঐ রকম উপাদানগত ঐক্যেই সৃষ্টি হয়েছি এবং আমাদের চেতনা সর্বদা অন্য সবকিছুতে একই ঐকতান খোঁজে। এই ঐকতানই সুন্দরের সৃষ্টি করে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হল এই ঐকতানী সুরের ছন্দ। সাহিত্য-শিল্প যত বেশি বিশ্ব-প্রকৃতি তথা বস্তু-নিকট ততই তা ব্যঞ্জনাময় হৃদয়স্পর্শী।

এই অর্থে প্রগতিশীল লেখক নামটি ত্রুটিপূর্ণ। শিল্পী বা লেখক স্বভাব-প্রগতিশীল। তবু এই শব্দটি ব্যবহার করা প্রয়োজন কারণ বিভিন্ন লোকের কাছে প্রগতির অর্থ বিভিন্ন। আমাদের কাছে প্রগতিশীল তাই যা আমাদের মধ্যে কাজ করার শক্তি যোগায়। এই শক্তি বন্ধ্যাত্ব ও অবক্ষয়ের কারণগুলি বস্তুগতভাবে উদ্ঘাটন করে তা অপসারণে আমাদের সহায়তা করে। যাতে আমরা আবার মানুষ হয়ে উঠতে পারি। নশ্বর জীবন নিয়ে হাহুতাশ করে হৃদয়কে হতাশা ও উদাসীনতায় নিমজ্জিত করার তথাকথিত কাব্যিক কল্পনা অর্থহীন। অলীক কল্পনার তথাকথিত প্রেমের রোমান্স লেখা ছাড়তে হবে। সাময়িকিগুলিতে যেন সেগুলির জায়গা না হয়। অনিয়ন্ত্রিত আবেগ অর্থাৎ সেন্টিমেন্ট নির্ভর কোনও শিল্প হয়না। আজ আমাদের কাছে একমাত্র সেই শিল্পের মূল্য আছে যা গতিশীল এবং যা পাঠককে জীবনসংগ্রামী করে।

বিষয়ীগত শিল্প আমাদের নিষ্ক্রিয়তা ও চেতনাগত জাড্যের দিকে নিয়ে যায়। এই ধরনের শিল্প ব্যক্তি বা সমাজ কারুর জন্যই ভাল নয়। বলতে দ্বিধা নেই আমি শিল্পকে উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করি। নিঃসন্দেহে, শিল্পের লক্ষ্য আমাদের সুন্দরের সাধনাকে পূর্ণতা দেওয়া। যা আমাদের চেতনিক আনন্দের চাবিকাঠি। কিন্তু আনন্দ বা সুখ নিজেই একটি ব্যবহারিক জিনিস। একই জিনিস আমাদের মধ্যে আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতি জাগাতে পারে।

অর্থাৎ অন্য সব কিছুর মতো সুন্দরেরও আপেক্ষিক মূল্য আছে। যে জিনিস একজনকে সুখ দেয়, অন্যকে তা কষ্ট দেয়। ধনী ব্যক্তি তার সুন্দর বাগানে বসে পাখির গান শুনে অতীন্দ্রিয় স্বর্গের কথা ভাবে। বুদ্ধিমান মানুষ সম্পদের এই আড়ম্বরকে শ্রমিকের রক্তে কলঙ্কিত বলে মনে করে। যা তার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয়।

মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যই আদর্শ স্বপ্ন। ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয়, নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা সফল হননি। বুদ্ধ, খ্রিস্ট, মুহাম্মাদ সহ সমস্ত প্রফেট নৈতিক অনুশাসনের উপর সমতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেছেন। আজ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য এমন নৃশংসতার সাথে প্রদর্শিত হচ্ছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। প্রবাদে বলে, একবার ব্যবহৃত প্রযুক্তি পুনরায় প্রয়োগ প্রচেষ্টা মূর্খতার লক্ষণ। আমরা যদি পুনরায় তথাকথিত ধর্ম-নৈতিকতার সাহায্যে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করি, আমরা আবার ব্যর্থ হব।

তাহলে কি আমরা আমাদের আদর্শ ত্যাগ করব? যদি তাই হয়, তাহলে মানব জাতিরও বিনাশ হতে পারে। যে আদর্শকে আমরা সভ্যতার প্রত্যুষ থেকেই লালন করে আসছি; যার জন্য মানুষ কত ত্যাগ স্বীকার করেছে; যা ধর্মের জন্ম দিয়েছে, মানব সমাজের ইতিহাস এই আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রামের ইতিহাস, আমাদেরও সেই আদর্শকে নিজেদের সামনে রাখতে হবে। আমাদের একে বস্তুগত নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর অশ্লীল অহংকার, দাম্ভিকতা এবং অসংবেদনশীলতার সাথে সৌজন্য, বিশ্বাস ও সংগ্রামের দ্বন্দ্ব জাগাতে হবে। এবং আমাদের শিল্প-সাহিত্য তখনই তা অবলোকন করবে যখন আমাদের শৈল্পিক দৃষ্টি সমগ্র মহাবিশ্বকে অখণ্ডতায় দেখতে শিখবে। এইভাবে অখণ্ড মানবতা বিষয়বস্তু গঠন করলে তা আর একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির গোলামি করবে না। তখন শোষণের সামাজিক ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হবে। তখন মানবতা পুঁজিবাদ, সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারবে। এবং সামান্য কাগুজে সৃজনশীল কাজ করার পরে আমরা চুপচাপ এবং নির্বোধ হয়ে বসে থাকব না, আমরা সক্রিয়ভাবে সেই নতুনের পুনর্গঠনে অংশ নেব যা সৌন্দর্য, সুরুচি এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক। সাহিত্যের ভূমিকা কেবল আমোদ বা বিনোদন প্রদান করা নয়। তা সমাজের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের মশাল বহনকারী।

অভিযোগ করা হয় সাহিত্যিকরা ভারতীয় সমাজে তাদের প্রাপ্য সম্মান পান না। অন্যান্য সভ্য দেশে সাহিত্যিকরা সম্মানীয় গণ্য হন। দেশের সর্বোচ্চ স্ট্যাটাসের লোকেরা এঁদের সাথে দেখা করা এবং এঁদের সাথে পরিচয়কে সম্মানের বলে মনে করে। আমাদের দেশ এখনও অনেক ভাবেই মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে রয়েছে। আর্থসমাজ জীবন নির্বাহের জন্য ধনীদের চাটুকারিতা, আধুনিক সমাজের গতির নিয়ম সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা আর্থসামাজিক বিচ্ছিন্নতা তথা আত্মকণ্ডুয়নের জন্য লেখকদের শ্রেণি হিসেবে পরিত্যাগ করে। লেখকরা জন্ম নেন তাদের বানানো যায়না। একথা ঠিক। কিন্তু অ্যারিস্টটল যেমন বলেন, কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক শৃঙ্খলা বিস্মৃত হওয়া লেখকদের উচিৎ নয়। লেখার সাধারণ প্রবণতাই লেখক হবার জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য তাকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। তা নাহলে তা আর এক অচলায়তন।

আমাদের আদর্শ ব্যক্তিকতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ নয়। কারণ সাহিত্য ব্যক্তিকে আর্থসমাজ থেকে আলাদা কিছু হিসাবে দেখে না। বরং তাকে একটি আর্থসামাজিক একক হিসাবে দেখে। কারণ তার অস্তিত্ব সামগ্রিকভাবে সেই আর্থসমাজের উপর নির্ভরশীল। আর্থসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তার কোনো এনটিটি (Entity) নেই। সুতরাং যারা শিক্ষিত ও পরিশীলিত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সমাজের প্রতি তাদের কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা যেমন পুঁজিপতিকে পরগাছামির জন্য আত্মসাৎকারী ও নিপীড়ক বলে মনে করি, তেমনি সর্বোত্তম শিক্ষা লাভের পরে যারা তা নিছক ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেন তাদের নিন্দা করা উচিৎ। বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হচ্ছে সব রকমভাবে আর্থসমাজের সেবা করা। তাদের কেবল ভাল লেখার শিল্প-যোগ্যতা অর্জন নয়, আর্থসমাজের

সাধারণ অবস্থার সাথেও সম্যক পরিচিতি থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক লেখকদের প্রতিবেদনে দেখি সেখানে জীবন, সাহিত্য, অর্থনৈতিক সমস্যা, ঐতিহাসিক বিতর্ক, দর্শন সম্পর্কিত এমন একটি বিষয় নেই যা আলোচনা করা হয় না। তাঁদের সাথে নিজেদের তুলনা করলে আমাদের অজ্ঞতার জন্য সত্যিই লজ্জা হয়। তাই আমাদের লেখকদের সাংস্কৃতিক মান বাড়াতে হবে। আমি জানি বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটি করা কঠিন, তবু আসুন আমরা অন্তত চেষ্টা করি। পাহাড়ের চূড়ায় না পৌঁছালেও অন্তত নিজেদেরকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে তুলে ধরব। আমিত্ব-প্রেম সহ কর্মসূচি পরিচালনা করে ও সেই প্রেমের অভিব্যক্তির মাধ্যমে আমরা সব বাধা অতিক্রম করতে পারি। যারা ধন-সম্পদের পেছনে ছুটছে আমিত্ব-প্রেমের মন্দিরে তাদের স্থান নেই। দেশের জনসাধারণকে মানসিক শুশ্রুষা করেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব। মানবতার সেবা করার আনন্দই হবে আমাদের পুরস্কার। আর্থসমাজের সাথে জিতি বা হারি, সত্যিকারের শিল্পী হিসাবে আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং সস্তা আত্মপ্রদর্শনীকে ঘৃণা করা উচিত।

আলোচিত বিষয়কে ভিত্তি করেই ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সমিতি গঠিত হয়। সমিতি সংগ্রামের বার্তা বাহক হিসেবে শিল্প-সাহিত্য চায়। ভাষার সমস্যার সাথে এর যোগ নেই। আইডিওলোজি ভাষাকে সহজ ও উন্নত করে। লেখার বিষয়বস্তু সঠিক লাইনে থাকলে ফর্ম নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। সুবিধাভোগী শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার সাহিত্য সেই শ্রেণির ফর্ম গ্রহণ করে। জনসাধারণের সাহিত্য তাদের ভাষায় কথা বলবে। আমাদের উদ্দেশ্য প্রগতিশীল সাহিত্য বিকাশের সহায়ক পরিবেশ রচনা করা। ভারতের সমস্ত সাহিত্য কেন্দ্রে আমাদের সমিতির শাখা স্থাপন করতে চাই। আমরা সেই কেন্দ্রগুলিতে অধ্যাবসায়, আলোচনা এবং সমালোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল সাহিত্যিক জীবনকে সংগঠিত করতে চাই। এভাবেই আমাদের সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটবে। প্রতিটি প্রদেশে ও ভাষাগত অঞ্চলে সমিতির একটি শাখা এজন্য প্রয়োজন যাতে আমাদের বার্তা দেশের সমস্ত অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারি। বিগত কিছু সময় ধরে ভারতীয় লেখকরা এ ধরনের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের সাহিত্য জগতে এই ধরনের সমস্ত প্রগতিশীল প্রবণতাকে বিকাশে সহায়তা করা।

লেখকদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি আর্থসমাজিক নিষ্ক্রিয়তা। চোখ বন্ধ করে থাকলে এই বাস্তবতা পালটায় না। আসলে এই নিষ্ক্রিয়তার পক্ষে যুক্তি সাজাতে তারা বলে আর্থসামাজিক সক্রিয়তা অসহিষ্ণুতা এবং সংকীর্ণ মানসিকতার সংক্রমণ করে। এইরকম বিশুদ্ধতাবাদীরা (পিউরিটান) লিবারটিনের চেয়ে বেশি অনিষ্টকর। লিবারটিনকে পারা গেলেও অহংকারী পিউরিটানকে নৈব নৈব চ। আসলে যতদিন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল নিছক বিনোদন, যতদিন তা জীবন থেকে পলায়ন বৃত্তির মাধ্যম ছিল, যখন জীবন ও তার দুঃখ-কষ্টের উপর সামান্য অশ্রু বর্ষণের দাবি ছিল, তখন সাহিত্যিকের সামাজিক সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না।

সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিকোণ লেখকের কর্তব্য চিহ্নিত করে দেয়। এই দৃষ্টিকোণে প্রগতিশীল সাহিত্য অর্থে বোঝায় চিন্তাশীল, স্বাধীনতা ও সুন্দরের চেতনা জাগায় এমন সাহিত্য। এই সাহিত্য সৃজনশীল ও জীবনের বস্তু নিষ্ঠতায় আলোকিত। তা পাঠককে কর্মের দিকে নিয়ে যায় এবং তা কোনোরূপ মাদক বাচক নয়। ফলে তা পাঠকের চেতনাকে ঘুম বাচক রক্ষণকামিতায় সংক্রামিত করে না। কারণ চেতনিক ঘুম অর্থাৎ মৃত্যু! -

পরবর্তী অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

কবিতা

রোদ্দুরের কলম

তুষার ভট্টাচার্য

পুবালি ভোর রোদ্দুরের স্বপ্নীল তুলি, কলম দিয়ে আমি
ঠিক এই মুহূর্তে
মুছে দিতে চাই -
দেশজুড়ে জেগে ওঠা
সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিদ্বেষ,
হিংসা, আর বিভেদের পাঁচিল ;
টাপুর টুপুর বৃষ্টি জলে ভেজা এই দেশের নরম মাটি
তৃণঘাসে
দু'হাতে করে নীরবে ছড়িয়ে দিতে চাই
সম্প্রীতির অক্ষর বীজ ;
ধর্মান্ধদের রক্তাক্ত অস্ত্র মাখা হাতে
পরিয়ে দিতে চাই ভালবাসার রাখি ;
ধ্বস্ত, বিপন্ন এই দেশের উদার আকাশে
বাতাসে আবার নিশ্চয়ই
ধ্বনিত হবে অমল বন্ধুতার জয়গান ;
ভোরের আলোর পাখিরা নীরবে
শোনাবে - 'সবার উপর মানুষ সত্য' গান]

রক্ষ-কথা

ভাস্বর রুজ

শোনা যাচ্ছে শিক্ষায় দুর্নীতি
আহা দেশে যেন কত সুনীতি!
অবৈধ প্রার্থীর বৈধ নিয়োগের দাবি
চুপ! অনশনক্লিষ্ট রাস্তায় খাবি খাবি !

খবর করেছে ছোট হায়েনা বড় হায়েনাকে
ইডি সিবিআই এলো কত ঝাকে ঝাকে
মিডিয়া করল কত কথা কথা খেলা
শোনা যায় কেবল হম্বি তম্বি মেলা!

পড়ল জালে এক মন্ত্রী
সাথে চুনোপুটি আর গোটা কয়েক সান্ত্রী
এমনি করেই গেল, গেল বেলা
চলেই যাচ্ছে দিন, এমনি এক খেলা!

প্রার্থীরা রইল বসেই, পথ
দিন গোনে কবে পেরোবে, গতি শ্লথ!
বিচার চলছে যে রুখবে কে
কাগজ খবর লেখে, টিভিও মাপে জোকে!

এই করেই দিন যায় মেলা
বড্ড সহজ রক্ষের এই ছু কিতকিত খেলা!!

সংরক্ষণ (EWS)

রঞ্জন পাড়ুই

সংরক্ষণ EWS নিয়ে হাতে
চাকুরি-শিক্ষা পাতে পাতে
এসসি-এসটি-বিসি ওরাই কেবল পাবে?
আমরা কি রব শুধুই নীরবে?
উচ্চবর্ণ বলে কি ভাই নেই অধিকার?
শাহেনশা নিয়ে এল EWS স্বাধীকার !
সে ছিল হৃদয় সম্রাট, আর কী দেব তাকে
তবু অনিঃশেষ দিয়েছি যে মগজটাকে
উপঢৌকন!
অষ্ট্ লক্ষ আয়ের নিচে পাব চাকুরি কোটা
দশ, বেসরকারি-সরকারি শিক্ষা ক্ষেত্র হবে মুক্ত, বালবাচ্চা
পাবে শিক্ষা গোটা গোটা!

নিন্দুকে বলে অন্য কথা
ব্রিটিশ গেছে কবে, সেসব গল্প-গাঁথা
বিভাজনের খেলা তার হয়েছে উন্মোচিত
কতকাল, আজ খেলায় অন্য মাত্রা টানে,
তারই আত্মার আত্মীয় শেল হানে
মানব ঐক্যে প্রতিদিন!

চাকরি কোথায়, তুমি তাতে দেবে সংরক্ষণ?
প্রশ্ন কি কেউ করেছে, রয়েছে জেগে সারাক্ষণ!
তোমার কর্পোরেট সখা-ইয়ার-দোস্ত মিলে করেছ ভাগ পিঠে
মাল তুলেছো ঘরে কাড়িকাড়ি ইঠে!
তাতেই ককিয়ে গিয়ে সবে
কোটা চায়, তুমি বল, হবে হবে!
তুমি দিচ্ছ কোটা কালে কাল
কত দিয়ে তুমি, বল, হয়েছ লালে লাল!

জাত পাত বর্ণ গোত্র বিভাজন বিষ
এবার নিজে নিজে মর, কর হিস্ হিস
এই তো চায়, আর কে পায় নয়া বেহ্মা হাসে অট্টহাসি!
বেহ্মা কি ভুলে গেছে, তার লেজ আর গোবরের দূরত্ব
নয় বেশি,
ইতিহাস পরায় তার গলায় ফাঁসি!

তখন অন্য খেলার দিন
কোটার (Quota) দেওয়া নেওয়া ক্ষীণ-লীন
সোশ্যাল সারপ্লাস যত, বেরোয় দ্রুত
সাপের আগল থেকে হয়ে চ্যুত !
দোলা দোলা বসন্ত থাকে কি দূরে
প্রেমের নতুন ভুবন মাতে সেই সুরে!

মানিক জ্যোতি দাস এর দুটি কবিতা

এই মেয়ে তুই ওঠ

তোর ধর্ষণের রক্তমাখা মাটিতে বাকি মদটুকু শেষ করে
নিঃশঙ্ক উঠে গেল ওরা ।
এই মেয়ে তুই ওঠ।

ওই দ্যাখ তোর চোখের জল আর যন্ত্রণাকে লালসার
বীর্যে অপমান করে ওরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
দাবার চৌষট্টি ঘর আর গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে
ওদের বরণ করে ঘরে তুলছে মস্ত মিছিলের লাইন।

এই মেয়ে তুই শোন্। মিছিলের স্লোগান আজ পাল্টে
গেছে বিলকুল।ওই মিছিলের কাছে তোর কোনো চাওয়া
নেই, তোর কোনো পাওয়া নেই।

তোর কান্না যখন বিদ্রূপের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে
বারবার তোরই কাছে ফিরে আসে তখন---

এই মেয়ে
তোর চোখের জল মোছ।
এই মেয়ে
তোর চোখে জ্বাল আগুন।

অর্ধেক মানবীর পৃথিবী

পুরুষবাদী বেয়নেটে নগ্ন মানবতা নারীকে মুড়ে রাখতে
চায় আপাদমস্তক।

আলোকিত সভ্যতার মানবীশক্তি আজ গুহামানবীয়
জড়চিন্তার যাঁতাকলে পিষ্ট। তার শরীরী ভাঁজে নাকি
মানুষ কামুক।

কামুক মানুষ যাক রসাতলে। তাদের জন্য নামুক
কঠোর কানুন। তবু মাতা ভগ্নী জায়া রূপে যে নারী
নিরন্তর ঘরে বাইরে সুষমায় ভোরে তোলে জগৎ
সংসার তার জীবনবোধের স্বাধীন নির্বাচন হোক
নির্বাধ।

অর্ধেক মানবীর পৃথিবীকে আজ নারী ফিরে পাক আপন
গৌরবে।

তোমার দূরবিন

বরুণ শ্যেন

তোমার দূরবিন ঝাপসা ভীষণ
ধরা পড়ছে না কিছু
আমি তো বেশ দেখতে পাচ্ছি
খালি চোখেই সব কিছু;
মানুষ থেকে সমাজ-মন
বিষিয়ে উঠছে প্রতিক্ষণ
প্রাণ পাখি মোর
কাঁদছে আজ ভীষণ...

মনে মনে কত আগুন
পুষছে অশেষ ঘৃণা
সবার উপর আমিত্ব সত্য
মনে নেই আজ তা;
মানুষ থেকে সমাজ-মন
বিষিয়ে উঠছে প্রতিক্ষণ
প্রাণ পাখি মোর
কাঁদছে আজ ভীষণ...

ধোঁয়ায় ঢাকছে সবার আকাশ
ধুলো জমছে নিরন্তর
দিনেই আজ গভীর আঁধার
আলো জ্বালো বরং;
মানুষ থেকে সমাজ-মন
বিষিয়ে উঠছে প্রতিক্ষণ
প্রাণ পাখি মোর
কাঁদছে আজ ভীষণ...

তোমার দূরবিন ঝাপসা ভীষণ
ধরা পড়ছে না কিছু
আমি তো বেশ দেখতে পাচ্ছি
খালি চোখেই সব কিছু;
মানুষ থেকে সমাজ-মন
বিষিয়ে উঠছে প্রতিক্ষণ
প্রাণ পাখি মোর
কাঁদছে আজ ভীষণ...

---

44 পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

লেখক সম্পর্কে:

প্রেমচাঁদ আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুস্তানি লেখকদের একজন। তিনি হিন্দি ও উর্দু উভয় ভাষাতেই লিখতেন। হিন্দি সাহিত্যে বস্তুবাদ প্রবর্তনকারী প্রথম লেখক হওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই, তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস এবং ছোট গল্প লিখেছেন যা নিম্ন, মধ্য এবং শ্রমিক শ্রেণির জীবন ও সংগ্রামকে চিত্রিত করেছে। তাঁর সাহিত্য কীর্তি যেমন ইদগাহ, কর্মভূমি এবং গোদান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে । তিনি 31শে জুলাই, 1880-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪ই অক্টোবর, 1936-এ তাঁর দেহাবসান হয়।

Issue date 27 April 2023
Vol. 5, Issue 1 Voice Mark

সোসিও প্ল্যান কালচার অরগানাইজেশন (এসপিসিও)

রেজিস্ট্রেশন নং— IV-120700079 / 2021

ডিহিপাড়া ♦ লালগোলা ♦ মুর্শিদাবাদ ♦ পিন-৭৪২১৪৮

সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় আর্থসমাজ অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি পড়ুন ও পড়তে উৎসাহিত করুন—

'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী 'অস্তিত্ব'	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী 'অস্তিত্ব'	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫

Published by Md. Azad Hossain from Bhagwanpur, Ashariadaha, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.